কহেন কবি কালিদাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

০১. যে শহরে আমি ও ব্যোমকেশ 2

০২. সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখি 30

০৩. নৈশ ভোজনের পর 62

০৪. প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যুরহস্য 89

০৫. ব্যোমকেশ গল্প আরম্ভ করিল 116

০১. যে শহরে আমি ও ব্যোমকেশ

যে শহরে আমি ও ব্যোমকেশ হগুপ্তাখানেকের জন্য প্রবাসযাত্রা করিয়াছিলাম তাহাকে কয়লা-শহর বলিলে অন্যায় হইবে না। শহরকে কেন্দ্র করিয়া তিন-চার মাইল দূরে দূরে গোটা চারেক কয়লার খনি। শহরটি যেন মাকড়সার মত জাল পাতিয়া মাঝখানে বসিয়া আছে, চারিদিক হইতে কয়লা আসিয়া রেলওয়ে স্টেশনে জমা হইতেছে এবং মালগাড়িতে চড়িয়া দিগবিদিকে যাত্রা করিতেছে। কর্মব্যস্ত সমৃদ্ধ শহর; ধনী ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, কয়েকটি বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে, উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দালাল মহাজনের ছড়াছড়ি। পথে মোটর ট্যাক্সি বাস ট্রাকের ছুটাছুটি। কাঁচা মালের সহিত কাঁচা পয়সার অবিরাম বিনিময়। শহরটিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে-কয়লা। চারিদিকে কয়লার কীর্তন, কয়লার কলকোলাহল। শহরটি মোটেই প্রাচীন নয়, কিন্তু দেখিয়া মনে হয় অদৃশ্য কয়লার গুড়া ইহার সর্বাঙ্গে অকালবার্ধক্যের ছায়া ফেলিয়াছে।

যাঁহার আহ্বানে আমরা এই শহরে আসিয়াছি তিনি ফুলঝুরি নামক একটি কয়লাখনির মালিক, নাম মণীশ চক্রবর্তী। কয়েক মাস যাবৎ তাঁহার খনিতে নানা প্রকার প্রচ্ছন্ন উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল। খনির গর্ভে আগুন লাগা, মূল্যবান যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া নষ্ট হওয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনা ঘটিতেছিল; কুলি-কাবাড়িদের মধ্যেও অহেতুক অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। একদল লোক তাঁহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; এরূপ অবস্থায় যাহা মনে করা স্বাভাবিক তাহাই মনে করিয়া মণীশবাবু পুলিস ডাকিয়াছিলেন। অনেক নূতন লোককে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। শেষ পর্যন্ত গোপনে ব্যোমকেশকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

একটি চৈত্রের সন্ধ্যায় আমরা মণীশবাবুর গৃহে উপনীত হইলাম। শহরের অভিজাত অঞ্চলে প্রশস্ত বাগান-ঘেরা দোতলা বাড়ি। মণীশবাবু সবেমাত্র খনি হইতে ফিরিয়াছেন, আমাদের সাদর সম্ভাষণ করিলেন। মণীশবাবুর বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, গৌরবর্ণ সুপুরুষ, এখনও শরীর বেশ সমর্থ আছে। চোয়ালের হাড়ের কঠিনতা দেখিয়া মনে হয় একটু কড়া মেজাজের লোক।

ড্রয়িং-রুমে বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবাতার পর মণীশবাবু বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, এখানে কিন্তু আপনাদের ছদ্মনামে থাকতে হবে। আপনার নাম গগনবাবু, আর অজিতবাবুর নাম সুজিতবাবু। আমার আসল নাম চলে সকেলই বুঝতে পারবে আপনার কী উদ্দেশে এসেছে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ তো, এখানে যতদিন থাকব। গগনবাবু সেজেই থাকব। অজিতেরও সুজিত সাজতে আপত্তি নেই।'

দ্বারের কাছে একটি যুবক দাঁড়াইয়া অস্বচ্ছন্দভাবে ছট্‌ফট করিতেছিল, বোধহয় ব্যোমকেশের সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রতীক্ষ করিতেছিল। মণীশবাবু ডাকিলেন, 'ফণী।'

যুবক উদগ্রীবিভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। মণীশবাবু আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমার ছেলে ফণীশ। —ফণী, তুমি জানো এরা কে, কিন্তু বাড়ির বাইরে আর কেউ যেন জানতে না পারে।'

ফণীশ বলিল, 'আজ্ঞে না।'

'তুমি এবার এঁদের গোস্ট-রুমে নিয়ে যাও। দেখো যেন ওঁদের কোনো অসুবিধা না হয়।–আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, চা তৈরি হচ্ছে।

ড্রয়িং-রুমের লাগাও গোস্ট-রুম। বড় ঘর, দুটি খাট! টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি উপযোগী আসবাবে সাজানো, সংলগ্ন বাথরুম। ফণীশ আমাদের ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল ।

ছেলেটিকে কেশ শান্তশিষ্ট এবং ভালোমানুষ ঋলিয়া মনে হয়। বাপের মতই সুপুরুষ, কিন্তু দেহ-মনের পূর্ণ পরিণতি ঘটিতে এখনও বিলম্ব আছে; ভাবভঙ্গীতে একটু ছেলেমানুষীর রেশ রহিয়া গিয়াছে । বয়স আন্দাজ তেইশ-চব্বিশ।

কেশবাস পরিবর্তন করিতে করিতে দুই-চারিটা কথা হইল; ফণীশ লাজুকভাবে ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তর দিল। সে পিতার একমাত্র সন্তান, এক বছর আগে তাহার বিবাহ হইয়াছে। সে প্রত্যহ পিতার সঙ্গে কয়লাখনিতে গিয়া কাজকর্ম দেখাশুনা করে।

লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশের কথার উত্তর দিতে দিতে সে যেন একটা অন্য কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বলিতে গিয়া সংকোচবেশে থামিয়া যাইতেছে।

ফণীশ কী বলিতে চায় শোনা হইল না, আমরা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে চা ও জলখাবার উপস্থিত হইয়াছে; আমরা বসিয়া গেলাম।

চায়ের আসরে কিন্তু মেয়েদের দেখিলাম না, কেবল আমরা চারজন। অথচ বাড়িতে অন্তত দুইটি স্ত্রীলোক নিশ্চয় আছেন। মণীশবাবু বোধকরি পুরাপুরি স্বদেশীবর্জন করেন না। তা আজকালকার সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার যুগে একটু অন্তরাল থাকা মন্দ কি ?

পানাহার শেষ করিয়া সিগারেট ধরিইয়াছি, একটি প্রকাণ্ড গাড়ি আসিয়া বাড়ির সামনে থামিল। গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। গেরিলার মত চেহারা, কালিমাবেষ্টিত লোক দুইটিতে মন্থর কুটিলতা। মুখ দেখিয়া চরিত্র অধ্যয়ন যদি সম্ভব হইত বলিতাম লোকটি মাহাপাপিষ্ঠ।

মণীশবাবু খুব খাতির করিয়া আগন্তুককে ঘরে আনিলেন, আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'ইনি শ্রীগোবিন্দ হালদার, এখানকার একটি কয়লাখনির মালিক। এঁরা হচ্ছেন শ্রীগগন মিত্র এবং সুজিত কন্দ্যোপাধ্যায় ; আমার বন্ধু, কলকাতায় থাকল। বেড়াতে এসেছেন।'

গোবিন্দবাবু তাঁহার শনৈশ্চর চক্ষু দিয়া আমাদের সমীক্ষণ করিতে করিতে মণীশবাবুকে বলিলেন, 'খবর নিতে এলাম। খনিতে আর কোনো গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

মণীশবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'গণ্ডগোল তো লেগেই আছে। পরশু রাত্রে এক কাণ্ড। হঠাৎ পাঁচ নম্বর পিট্-এর পাম্প বন্ধ হয়ে গেল। ভাগ্যে পাহারাওয়ালার সজাগ ছিল তাই বিশেষ অনিষ্ট হয়নি। নইলে—'

গোবিন্দবাবু মুখে চুকচুক শব্দ করিলেন। মণীশবাবু বলিলেন, 'আপনারা তো বেশ আছেন, যত উৎপাত আমার খনিতে। কেন যে হতভাগাদের আমার দিকেই নজর তা বুঝতে পারি না।'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'আমার খনিতেও মাস ছয়েক আগে গোলমাল শুরু হয়েছিল। আমি জানি পুলিসের দ্বারা কিছু হবে না, আমি সরাসরি চুর লংগালাম। আটজন লোককে গুপ্তচর লাগিয়েছিলাম, দিন অষ্টেকের মধ্যে তারা খবর এনে দিল কার্য শয়তানি করছে; পাঁচটা লোক ছিল পালের গোদা, তাদের একদিন ধরে এনে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিলাম। তাদের বরখাস্ত করতে হল না, নিজে থেকেই পালিয়ে গেল। সেই থেকে সব ঠাণ্ডা আছে।' বলিয়া তিনি দস্তুর গেরিলা-হাস্য হাসিলেন।

মণীশবাবু বলিলেন, 'আমিও গুপ্তচর লাগিয়েছিলাম কিন্তু কিছু হল না। যাকগে——' তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। সাধারণভাবে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। গোবিন্দবাবুর জন্য চা-জলখাবার আসিল, তিনি তাহা সেবন করিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি কিন্তু আমাদের

আশেপাশেই ঘুরিতে লাগিল। আমরা নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি একথা বোধহয় তিনি বিশ্বাস করেন নাই।

ঘণ্টাখানেক পরে তিনি উঠিলেন। মণীশবাবু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত গেলেন, আমরাও গেলাম। ড্রাইভার মোটরের দরজা খুলিয়া দিল। গোবিন্দবাবু মোটরে উঠিবার উপক্রম করিয়া ব্যোমকেশের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া হাসি-হাসি মুখে বলিলেন, 'দেখুন চেষ্টা করে।'

তিনি মোটরে উঠিয়া বসিলেন, মোটর চলিয়া গেল।

মণীশবাবু এবং আমরা কিছুক্ষণ দৃষ্টি-বিনিময় করিলাম, তারপর তিনি বিষণ্ণ সুরে বলিলেন, 'গোবিন্দ হালদার লোকটা ভারি সেয়ানা, ওর চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়।'

রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শয়ন করিতে এগারোটা বাজিল। শরীরে ট্রেনের ক্লান্তি ছিল, মাথার উপর পাখা চালাইয়া দিয়া শয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে ডুবিয়া গেলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

একজন ভৃত্য জানাইল, বড়কর্তা এবং ছোটকত ভোরবেলা কোলিয়ারিতে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখি আমাদের চা ও জলখাবার টেবিলের উপর সাজাইয়া একটি যুবতী দাঁড়াইয়া আছে।

বাড়ির মেয়েদের দেখি নাই, আমরা একটু থতমত খাইয়া গেলাম। ব্যোমকেশের সুস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে মেয়েটি নীচু হইয়া ঈষৎ জড়িতস্বরে বলিল, 'আমি ইন্দিরা, এবাড়ির বৌ। আপনারা খেতে বসুন।'

ফণীশের বৌ। শ্যামবর্ণা অনুদীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, মুখখানি তর্‌তরে; বয়স আঠারো-উনিশ। দেখিলেই বোঝা যায় ইন্দিরা লাজুক মেয়ে, অপরিচিত বয়স্থ ব্যক্তির সহিত সহজভাবে আলাপ করার অভ্যাসও তাহার নাই। নেহাত বাড়িতে পুরুষ নাই, তাই বেচারী বাধ্য হইয়া অতিথি সৎকার করিতে আসিয়াছে।

আমরা আহারে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'বোসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ইন্দিরা একটি সোফার কিনারায় বসিল।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় একটু চুমুক দিয়া গলা ভিজাইয়া লইল, তারপর জলখাবারের রেকবি টানিয়া লইল, 'আজ আমাদের উঠতে দেরি হয়ে গেল। কত কি ভোরবেলাই কাজে বেরিয়ে যান?'

'হ্যাঁ, বাবা সাতটার সময় বেরিয়ে যান।'

'আর তোমার কর্তা?'

ইন্দিরার ঘাড় অমনি নত হইয়া পড়িল। সে চোখ না তুলিয়াই অস্ফুটস্বরে বলিল, 'উনিও।' তারপর জোর করিয়া লজ্জা সরাইয়া বলিল, 'ওঁরা বারোটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া করেন, আবার তিনটের সময় যান।'

ব্যোমকেশ তাহার পানে চাহিয়া মিটমিটি হাসিল, আর কিছু বলিল না। আহার করিতে করিতে আমি ইন্দিরাকে লক্ষ্য করিলাম। সে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে ব্যোমকেশের প্রতি চকিত কটাক্ষপাত করিতেছে। মনে হইল অতিথি সৎকার ছাড়াও অন্য কোনও অভিসন্ধি আছে। ব্যোমকেশ কে তাহা সে জানে, ফণীশ স্ত্রীকে নিশ্চয় বলিয়াছে, তাই ব্যোমকেশকে কিছু বলিতে চায়। সে মনে মনে কিছু সংকল্প করিয়াছে কিন্তু সংকোচবশত বলিতে পারিতেছে না। কাল রাত্রে ফণীশের মুখেও এইরূপ দ্বিধার ভাব দেখিয়াছিলাম।

প্রাতরাশ শেষ করিয়া চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ রুমালে মুখ মুছিল, তারপর প্রসন্নস্বরে বলিল, 'কি বলবে এবার বল।'

আমি ইন্দিরার মুখে সংকল্প ও সংকোচের টানাটানি লক্ষ্য করিতেছিলাম, দেখিলাম সে চমকিয়া উঠিল, বিস্ফোরিত চোখে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর

তাহার সব উদ্বেগ এক নিশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল, ‘ব্যোমকেশবাবু, আমার স্বামীকে রক্ষে করুন। তাঁর বড় বিপদ।’

ব্যোমকেশ উঠিয়ে গিয়া সোফায় বসিল, ইন্দিরাকে পাশে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল, ‘বোসো। কি বিপদ তোমার স্বামীর আমাকে বলো।’

ইন্দিরা তেরছাভাবে সোফার কিনারায় বসিল, শীর্ণ সংহত স্বরে বলিল, ‘আমি-আমি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব না। আপনি যদি সাহায্য করেন, উনি নিজেই বলবেন।’

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, ‘খনি সম্বন্ধে কোনো কথা কি?’

ইন্দিরা বলিল, ‘না, অন্য কথা। আপনারা বাবাকে যেন কিছু বলবেন না। বাবা কিছু জানেন না।’

ব্যোমকেশ শান্ত আশ্বাসের সুরে বলিল, ‘আমি কাউকে কিছু বলব না, তুমি ভয় পেও না।’

‘ওঁকে সাহায্য করবেন?’

‘কি হয়েছে কিছুই জানি না। তবু তোমার স্বামী যদি নির্দোষ হন নিশ্চয় সাহায্য করব।’

‘আমার স্বামী নির্দোষ।’

‘তবে নির্ভয়ে থাকো।’

বাড়ির পাশের দিকে বাগানের কিনারায় একসারি ঘর। ইন্দিরার মুখে হাসি ফুটিবার পর আমরা সিগারেট টানিতে টানিতে সেইদিকে গেলাম।

সামনের ঘর হইতে একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। পরিধানে ফরাসডাঙ্গার ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি, ফিটফট চেহারা। চুলে নিশ্চয় কলপ লাগাইয়া থাকেন, কালো চুলের নীচে শ্বেতবর্ণ অঙ্কুর মাথা তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আমার নাম গগন মিত্র, ইনি সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। মণীশবাবুর অতিথি।’

ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমাদের সংবর্ধনা করিলেন, ‘আসুন, আসুন। আপনারা আসবেন কর্তার মুখে শুনেছিলাম। আমি সুরপতি ঘটক, এই অফিসের দেখাশোনা করি।’

সুরপতিবাবু আমাদের প্রকৃত নাম জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল, ‘এটা বুঝি কয়লাখনির অফিস। আপনি অফিস-মাস্টার।’

সুরপতিবাবু বলিলেন, ‘আজ্ঞে। কয়লাখনিতে একটা ছোট অফিস আছে, এটা বড় অফিস। আসুন না দেখবেন।’

ঘরগুলি একে একে দেখিলাম। বিভিন্ন ঘরে কেরানিরা খাতপত্র লইয়া কাজ করিতেছে, টাইপরাইটারের খটখটি শব্দ হইতেছে, দর্শনীয় কিছু নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে আমরা সুরপতিবাবুর অফিসে বসিলাম।

সাধারণভাবে কিছুক্ষণ বাক্যালাপ চালাইবার পর ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, ‘আপনাকে বলি, আমরা দুই বন্ধু মিলে একটা ছোটখাটো কয়লাখনি কেনবার মতলব করেছি। এখানে নয়, অন্য জেলায়। সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কি করে কয়লাখনি চালাতে হয় আমরা কিছুই জানি না; তাই মণীশবাবুর খনি দেখতে এসেছি। অফিসের কাজ, খনির কাজ, সব বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই।’

সুরপতিবাবু মহা উৎসাহে বলিলেন, ‘নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ আর বেশি কথা কি? অফিসের কাজ দুদিনে শিখে যাবেন; আর খনির কাজও এমন কিছু শক্ত নয়। তাছাড়া যদি দরকার হয় আমি আপনাকে খুব ভাল লোক দিতে পারি।’

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি রকম লোক?’

সুরপতিবাবু বলিলেন, ‘অফিসের কাজ জানে, কোলিয়ারির কাজ জানে এমন লোক। আমার নিজের হাতে তৈরি করা লোক।’

ব্যোমকেশ আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, 'তাই নাকি! তা কাজ-জোনা ভাল লোক পেলে আমরা নেব। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা হবে। অফিসের কাজকর্মও দেখব। আমরা এখন কিছুদিন আছি।'

অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

বারোটার সময় ফণীশ ও মণীশবাবু খনি হইতে ফিরিলেন। স্নানাহার সারিতে একটা বাজিয়া গেল। তারপর খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা চারজন মোটরে চড়িয়া কয়লাখনিতে চলিলাম।

মস্ত বড় মোটর। ফণীশ চালাইয়া লইয়া চলিল, আমরা তিনজন পিছনে বসিলাম।

মোটর শহর ছাড়াইয়া নির্জন রাস্তা ধরিল। মাইল তিনেক দূরে কয়লাখনি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সকলে সুরপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। উনি কতদিন আপনার কাজ করছেন?'

মণীশবাবু বলিলেন, 'প্রায় কুড়ি বছর। পাকা লোক।'

ব্যোমকেশ কহিল, ‘ওঁকে বলেছি আমরা একটা কয়লাখনি কিনব। তাই খোঁজ খবর নিতে এসেছি। আমাদের সত্যিকার পরিচয় দিইনি।’

মণীশবাবু বলিলেন, ‘ভালই করেছেন। সুরপতি। অবশ্য বিশ্বাসী লোক, দোষের মধ্যে বছর দুই আগে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছে।’

সুরপতিবাবুর চুলের কলপ এবং শৌখিন জাম-কাপড়ের অর্থ পাওয়া গেল। প্রৌঢ় বয়সে তরুণী ভার্য্যর চোখে যৌবনের বিভ্রম সৃষ্টি করার চেষ্টা স্বাভাবিক।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, ‘সম্প্রতি কেউ আপনার খনি কেনবার প্রস্তাব করেছিল?’

মণীশবাবু বলিলেন, ‘সম্প্রতি নয়, কয়েক বছর আগে। একজন মাড়োয়ারী। ভাল দাম দিতে চেয়েছিল, আমি বেচিনি।’

ব্যোমকেশ দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল, ‘এখানে অন্য যেসব খনির মালিক আছেন তাঁদের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব আছে?’

মণীশবাবু বলিলেন, ‘গাঢ় প্রণয় আছে এমন কথা বলতে পারি না, তবে মুখোমুখি ঝগড়া কারুর সঙ্গে নেই।’

‘এমন কেউ আছেন যিনি বাইরে ভদ্রতার মুখোশ পরে ভিতরে ভিতরে আপনার অনিষ্ট চিন্তা করছেন?’

‘থাকতে পারে, কিন্তু তাকে চিনিব কি করে?’

‘তা বটে। কাল রাত্রে যিনি এসেছিলেন-গোবিন্দ হালদার-তিনি কি রকম লোক?’

মণীশবাবু চিন্তা-মন্থর কণ্ঠে বলিলেন, ‘গোবিন্দ হালদারকে চেনা শক্ত। পাঁকাল মাছের মত চরিত্র, ধরা-ছোঁয়া যায় না। তবে গোবিন্দবাবুর ছোট ভাই এবং অংশীদার অরবিন্দ অতি বদ লোক। মাতাল, জুয়াড়ী্, দুশ্চরিত্র। বছর কয়েক আগে স্ত্রীটা আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে। তারপর থেকে অরবিন্দ একেবারে নামকটা সেপাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

আর কোনও কথা হইল না, আমরা কয়লাখনির এলাকায় প্রবেশ করিলাম।

কয়লাখনির বিস্তারিত বর্ণনা দিবার ইচ্ছা নাই। যাঁহারা স্বচক্ষে কয়লাখনি দেখেন নাই তাঁহারা নিশ্চয় রঙ্গমঞ্চে বা চিত্রপটে দেখিয়াছেন, এমন কিছু নয়নাভিরাম দৃশ্য নয়। বিশেষত এই কাহিনীতে কয়লাখনির স্থান খুবই অল্প; কয়লাখনিকে এই কাহিনীর কালো পশ্চাৎপট বলাই সঙ্গত। পশ্চাৎপট না থাকিলে কাহিনী উলঙ্গ হইয়া পড়ে, তাই রাখিতে হইয়াছে।

কয়লা! যাহার জোরে যন্ত্র চলিতেছে তাহাকে যন্ত্রের সাহায্যে মৃত্তিকার গভীর গর্ভ হইতে টানিয়া আনা হইতেছে; সভ্যতার চাকা ঘুরিতেছে। নমো যন্ত্র। তব খনি-খনিত্র নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অস্ত্র! নমো যন্ত্র। অলমিতি।

খনির ম্যানেজার তারাপদবাবুর সঙ্গে পরিচয় হইল। বয়স্ক লোক, খনির সীমানার মধ্যে তাঁহার বাসস্থান; রাশভারী জবরদস্ত লোক বলিয়া মনে হয়। তিনি আমাদের লইয়া খনির বিভিন্ন অংশের কার্যকলাপ দেখাইলেন। খনির গর্ভে অবতরণ করিবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা রাজী হইলাম না। সীতা পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল; আমাদের সেরূপ কোনও কারণ নাই।

অপরাহ্ণে আমরা তারাপদবাবুর অফিসে চা খাইলাম। সেখানে খনির ডাক্তার যতীন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য উচ্চ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হইল। কাজের কথা কিছু হইল না, সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, আমরা ছদ্মনামেই রহিলাম। এক সময় লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশ ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে বেশ ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে, ঘরের এক কোণে বসিয়া নিবিষ্ট মনে তাঁহার সহিত গল্প করিতেছে। ডাক্তার ঘোষ আমাদের সমবয়স্ক্, তিনিও খনিতেই ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল লইয়া থাকেন। তাঁহার কোট-প্যান্টুলুন-পরা চেহারায় জীবন-ক্লান্তির একটু আভাস পাওয়া যায়।

তারপর সন্ধ্যা হইলে আমরা আবার মোটরে চড়িয়া বাড়ির দিকে যাত্রা করিলাম।

রাত্রে আহারাদির পর মণীশবাবু উপরে শয়ন করিতে গেলেন, আমরা নিজের ঘরে আসিলাম। ফণীশ আমাদের সঙ্গে আসিল।

ব্যোমকেশ পাখা চালাইয়া দিয়া নিজের শয্যায় লম্বা হইল, সিগারেট ধরাইয়া ফণীশকে বলিল, 'বোসো। কী কাণ্ড বাধিয়েছ? বৌমাকে এত উদ্বিগ্ন করে তুলেছ কেন?'

ফণীশ চেয়ারে বসিয়া হাত কচুলাইতে লাগিল, তারপর কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'ইন্দিরাকে রাজী করিয়েছিলাম। আপনাকে বলতে, নিজে বলতে সাহস হয়নি—'

'কিন্তু কথাটা কী? তোমাদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে ভারি গুরুতর ব্যাপার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুতর ব্যাপার। একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছি ঘটনাচক্রে। বাবা যদি জানতে পারেন–'

ব্যোমকেশ বিছানায় উঠিয়া বসিল, 'খুনের মামলা।'

ফণীশ শীর্ণকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে, বিশ্রী ব্যাপার। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে, তারা জানতে পেরেছে যে আমরা–

'কি হয়েছিল সব কথা গুছিয়ে বল।'

ফণীশ অবশ্য সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারিল না। তাহার জেট-পাকানো কাহিনীকে আমি যথাসম্ভব সিধা করিয়া লিখিতেছি।–

এই শহরে একটি ক্লাব আছে। কৌতুকবশে তাহার নামকরণ হইয়াছো-কয়লা ক্লাব। ক্লাবের চাঁদার হার খুব উচু, তাই বড় মানুষ ছাড়া অন্য কেহ ইহার সভ্য হইতে পারে না। ফণীশ এই ক্লাবের সভ্য। আরও অনেক গণ্যমান্য সভ্য আছে; তন্মধ্যে উলুডাঙ্গা কয়লাখনির মালিক মৃগেন্দ্ব মৌলিক, ধুবিপোতা খনির মধুময় সুর এবং শিমুলিয়া খনির অরবিন্দ ও গোবিন্দ হালদার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্লাবে অপরাহ্নে টেনিস খেলা, ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়; সন্ধ্যার পর বিলিয়ার্ড্‌, পিংপং, তাস-পাশা চলে। বাজি রাখিয়া তাস খেলা হয়। কিন্তু ক্লাবের নিয়মানুযায়ী বেশি টাকা বাজি রাখা যায় না; তাই যাহাদের রক্তে জুয়ার নেশা আছে তাহাদের মন ভরে না। অরবিন্দ হালদার এই অতৃপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। কিন্তু উপায় কি? শহরে ভদ্রভাবে জুয়া খেলার অন্য কোনও আস্তানা নাই।

বছরখানেক আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ক্লাবের সভ্য হইয়াছিলেন। পয়সাওয়ালা লোক, মহাজনী কারবার খুলিয়াছিলেন, শহরে নবাগত। বাজার অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র অফিস আছে, কিন্তু থাকেন শহরের বাহিরে নির্জন রাস্তার ধারে এক বাড়িতে। শকুনি-মার্কা চেহারা, নাম প্রাণহারি পোদ্দার।

পোদ্দার মহাশয় ক্লাবে আসিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার সমবয়স্ক বৃদ্ধ ক্লাবে কেহ নাই, বেশির ভাগই ছেলে-ছোকরা, দুচারজন মধ্যবয়স্ক আছেন। ক্রমে দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় হইল। কিন্তু বয়সের পার্থক্যবশত কাহারও সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠত হইল না।

ফণীশ, মৃগেন মৌলিক, মধুময় সুর এবং অরবিন্দ হালদার এই চারজন মিলিয়া ক্লাবে একটি গোষ্ঠী রচনা করিয়াছিল। ফণীশ ছিল এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে ছোট, আর অরবিন্দ হলুদ ছিল সবচেয়ে বয়সে বড়। তাহার বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; দলের মধ্যে সে-ই ছিল অগ্রণী।

একদিন সন্ধ্যার পর ইহারা ক্লাবের একটা ঘরে বসিয়া ব্রিজ খেলিতেছিল, পোদ্দার মহাশয় আসিয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন। টেবিলের চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কে কেমন হাত পাইয়াছে দেখিলেন। অরবিন্দ অলসকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কন্ট্রাক্ট ব্রিজ জানেন?'

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, 'জানি।'

'খেলবেন?'

'খেলব। কি রকম বাজি?'

'এক টাকা পয়েণ্ট। চলবে?

'চলবে।'

যে রাবার খেলা হইতেছিল তাহা শেষ হইলে তাস কাটিয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন বাহির হইয়া গেল। প্রাণহরি পোদ্দার খেলিতে বসিলেন।

দেখা গেল পোদ্দার মহাশয় অতি নিপুণ খেলোয়াড়। কিন্তু সেদিন তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না, ভাল হাত পাইলেন না। খেলার শেষে হিসাব করিয়া দেখা গেল। তিনি একুশ টাকা হরিয়াছেন। তিনি টাকা শোধ করিয়া দিলেন।

তারপর হইতে প্রাণহারিবাবু প্রায় প্রত্যহই ফণীশদের দলে খেলিতে বসেন। কখনও হারেন, কখনও জেতেন; সকল অবস্থাতেই তিনি নির্বিকার। এইভাবে তিনি ফণীশদের দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন।

কয়েকমাস। এইভাবে কাটিল।

গত ফাল্গুন মাসে একদিন খেলিতে বসিয়া প্রাণহারিবাবু বলিলেন, 'আপনারা ব্রিজ ছাড়া অন্য কোনো খেলা খেলেন না?'

মধুময় সুর প্রশ্ন করিল, 'কি রকম খেলা?'

প্রাণহরি বলিলেন, 'এই ধরুন, পোকার কিংবা রানিং ফ্লাশ।'

মৃগেন মৌলিক বলিল, 'আমরা সব খেলাই খেলতে জানি। কিন্তু ক্লাবে জুয়া খেলার নিয়ম নেই। ব্রিজ তো আর জুয়া নয়, game of skill.' বলিয়া নাকের মধ্যে ব্যঙ্গ-হাস্য করিল।

প্রাণহরি তখন কিছু বলিলেন না। খেলা শেষ হইলে বলিলেন, 'একদিন আসুন না। আমার বাসায়, নতুন খেলা খেলবেন।'

কাহারও আপত্তি হইল না। অরবিন্দ বলিল, 'মন্দ কি। আপনি কোথায় থাকেন?'

প্রাণহরি বলিলেন, 'শহরের বাইরে উলুডাঙা খনির রাস্তায় আমার বাসা। একলা থাকি, আপনারা যদি আসেন বেশ জমজমাট হবে। কালই আসুন না।'

সকলে রাজী হইল। প্রাণহারি ট্যাক্সি ধরিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিজের গাড়ি নাই, ট্যাক্সির সহিত বাঁধা ব্যবস্থা আছে, ট্যাক্সিতেই যাতায়াত করেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর চারজন অরবিন্দের মোটরে চড়িয়া প্রাণহোরর গৃহে উপস্থিত হইল। শহরের সীমানা হইতে মাইল দেড়েক দূরে নির্জন রাস্তার উপর দোতলা বাড়ি, আশেপাশে দু-তিনশত গজের মধ্যে অন্য বাড়ি নাই।

প্রাণহারিবাবু পরম সমাদরের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, নীচের তলার একটি সুসজ্জিত ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ সাধারণভাবে বাক্যালাপ হইল। প্রাণহারিবাবু

বিপত্নীক ও নিঃসন্তান; পূর্বে তিনি উড়িষ্যার কটক শহরে থাকিতেন। কিন্তু সেখানে মন টিকিল না। তাই এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে একটি দাসী আছে, সেই তাঁহার রন্ধন ও পরিচর্যা করে।

এই সময় দাসী চায়ের ট্রে হাতে লইয়া প্রবেশ করিল, ট্রে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল, আবার এক থালা কাটলেট লইয়া ফিরিয়া আসিল। দিব্য-গঠন যুবতী। বয়স কুড়ি-বাইশ; রং ময়লা, কিন্তু মুখখানি সুন্দর, হরিণের মত চোখ দু'টিতে কুহক ভরা। দেখিলে বিপ্ল-চাকরানী শ্রেণীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। সে অতিথিদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল।

গরম গরম কাটলেট সহযোগে চা পান করিতে করিতে অরবিন্দ বলিল, 'খাসা কাটলেট ভেজেছে। এটি আপনার ঝি?'

প্রাণহারিবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। মোহিনীকে উড়িষ্যা থেকে এনেছি। রান্না ভাল করে।'

পানাহারের পর খেলা বসিল। সর্বসম্মতিক্রমে তিন তাসের খেলা রানিং ফ্লাশ আরম্ভ হইল। সকলেই বেশি করিয়া টাকা আনিয়াছিল, প্রাণহরিবাবু পাঁচশো টাকা লইয়া দেখিতে বসিলেন।

দুই ঘণ্টা খেলা হইল। বেশি হার-জিত কিন্তু হইল না; কেহ পঞ্চাশ টাকা জিতিল, কেহ। একশো টাকা হারিল। প্রাণহারিবাবু মোটের উপর হারিয়া রহিলেন। স্থির হইল তিন দিন পরে আবার এখানে খেলা বসিবে।

ফণীশের মনে কিন্তু সুখ নাই। সে তাঁস খেলিতে ভালবাসে বটে, কিন্তু জুয়াড়ী নয়। তাহার মাথার উপর কড়া প্রকৃতির বাপ আছেন, টাকাকড়ি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। দলে পড়িয়া তাহাকে এই জুয়ার ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু দল ছাড়িবার চেষ্টা করিলে তাহাকে হাস্যাম্পদ হইতে হইবে। ফণীশ নিতান্ত অনিচ্ছাভরে জুয়ার দলে সংযুক্ত হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দিন খেলা খুব জমিয়া গেল। মোহিনী মুগীর ফ্রাই তৈরি করিয়াছিল। চা সহযোগে তাহাই খাইতে খাইতে খেলা আরম্ভ হইল; তারপর মধ্যপথে প্রাণহারিবাবু বিলাতি হুইস্কির একটি বোতল বাহির করিলেন। ফণীশের মদ সহ্য হয় না, খাইলেই বমি আসে, সে খাইল না। অন্য সকলে খাইল। অরবিন্দ সবচেয়ে বেশি খাইল। খেলার বাজি উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল। সকলেই উত্তেজিত, কেবল প্রাণহারিবাবু নির্বিকার।

খেলার শেষে হিসাব হইল; অরবিন্দ প্রায় হাজার টাকা জিতিয়াছে, আর সকলে হারিয়াছে। প্রাণহারিবাবু দুইশত টাকা জিতিয়াছেন।

অতঃপর প্রতি হপ্তায় একদিন-দুইদিন খেলা বসে। খেলায় কোনও দিন একজন হারে, কোনও দিন অন্য কেহ হারে, বাকি সকলে জেতে। প্রাণহারিবাবু কোনও দিনই বেশি হারেন না, মোটের উপর লাভ থাকে।

খেলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পার্শ্বাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল; তাহা মোহিনীকে লইয়া। মধুময় এবং মৃগেন্দ্র হয়তো ভিতরে ভিতরে মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অরবিন্দ একেবারে নির্লজ্জভাবে তাহার পিছনে লাগিল। খেলার দিন সে সকলের আগে প্রাণহারিবাবুর বাড়িতে যাইত এবং রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া মোহিনীর সহিত রসালাপ করিত। এমন কি দিনের বেলা প্রাণহরিবাবুর অনুপস্থিতি কালে সে তাঁহার বাড়িতে যাইত এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। মোহিনীর সহিত অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতা কতদূর হইয়াছিল। বলা যায় না, তবে মোহিনী যে স্তরের মেয়ে তাহাতে সে বড়মানুষের কৃপাদৃষ্টি উপেক্ষা করিবে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

যাহোক, এইভাবে পাঁচ-ছয় হপ্তা কাটিল। ফণীশের মনে শান্তি নাই, সে বন্ধুদের এড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু এড়াইতে পারে না; অরবিন্দ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। তারপর একদিন সকলের জ্ঞানচক্ষু উম্মীলিত হইল। তাহারা জানিতে পারিল প্রাণহরিবাবু পাকা জুয়াচোর, তাক সুপ্রিয় মৃত সাফাই করেন। খুব খানিকটা বাচসা হইল, তারপর অতিথিরা খেলা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

হিসাবে জানা গেল অতিথিরা প্রত্যেকেই তিন-চার হাজার টাকা হারিয়াছে এবং সব টাকাই প্রাণহারির গর্ভে গিয়াছে। সবচেয়ে বেশি হারিয়াছে অরবিন্দ; প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

অরবিন্দ ক্লাবে বসিয়া আফসাইতে লাগিল, 'আসুক না হাড়গিলে বুড়ো্্, ঠেঙিয়ে হাড় গুড়ো করব।' মধুময়, মৃগেন্দ্র মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল। প্রাণহারিকে হাতে পাইলে তাহারাও ছাড়িয়া দিবে না।

প্রাণহারিবাবু কিন্তু হুঁশিয়ার লোক, তিনি আর ক্লাবে মাথা গলইলেন না।

দিন সাতেক পরে অরবিন্দ বলিল, 'ব্যাটা গা-ঢাকা দিয়েছে। চল, ওর বাড়িতে গিয়ে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আসি।'

ফণীশ আপত্তি করিল, 'কি দরকার। টাকা যা যাবার সে তো গেছেই—'

অরবিন্দ বলিল, 'টাকা আমাদের হাতের ময়লা। কিন্তু ব্যাটা ঠকিয়ে দিয়ে যাবে? তুমি কি বলে মৃগেন?'

মৃগেন বলিল, 'শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

মধুময় বলিল, 'ওর বাড়িতে একটা মেয়েলোক ছাড়া আর কেউ থাকে না, ভয়ের কিছু নেই।'

একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া প্রাণহারির বাড়ির দিকে চলিল। নিজেদের মোটরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়; ঐ রাস্তাটা নির্জন হইলেও, রাত্রিকালে উলুডাঙা কোলিয়ারি হইতে বহু যানবাহন যাতায়াত করে। তাহারা প্রাণহারির বাড়ির কাছে চেনা মোটর দেখিতে পাইবে; তাছাড়া অভিযাত্রীদের মোটর-চালকেরা মুক-বধির নয়, তাহারা গল্প করিবে। কাহাকেও উত্তম-মধ্যম দিতে হইলে সাক্ষীসাবুদ যথাসম্ভব কম থাকিলেই ভাল।

প্রাণহোরর বাড়ি হইতে একশো গজ দূরে ট্যাক্সি থামাইয়া চারজনে অবতরণ করিল। রাস্তা নিরালোক, মধুময়ের হাতে একটা বড় বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, তাহাই মাঝে মাঝে জ্বালিয়া জ্বালিয়া তাহারা বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল, ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরাইয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেল।

দ্বিতলের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। নীচে সদর দরজা খোলা। রান্নাঘর হইতে ছাঁক-ছোঁক শব্দ আসিতেছে, মোহিনী রান্না করিতেছে। সকলে শিকারীর মত নিঃশব্দে প্রবেশ করিল।

সদরে একটা লম্বা গোছের ঘর, তাহার বাঁ পাশ দিয়া দোতলায় উঠিবার সিড়ি। এইখানে দাঁড়াইয়া চারজনে নিম্নস্বরে পরামর্শ করিল, তারপর অরবিন্দ মধুময়ের হাত হইতে টর্চ লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,

'সিঁড়ির মাথায় দরজা আছে, মজবুত দরজা। ভিতর থেকে বন্ধ কি বাইরে থেকে বন্ধ বোঝা গেল না। ইয়েল-লক লাগানো।'

আবার পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, নীচের তলাটা ভাল করিয়া খুঁজিয়ে দেখা দরকার। বুড়ো ভারি ধূর্ত হয়তো উপরের ঘরে আলো জ্বালিয়া নীচে অন্ধকারে কোথাও লুকাইয়া আছে। অরবিন্দ রান্নাঘরের দ্বারে উঁকি মারিয়া আসিল, সেখানে মোহিনী দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া একা রান্না করিতেছে, অন্য কেহ নাই।

অতঃপর চারজনে পৃথকভাবে বাড়ির ঘরগুলি ও পিছনের খোলা জমি তল্লাশ করিতে বাহির হইল।

পনেরো মিনিট পরে সকলে সিঁড়ির নীচে ফিরিয়া আসিল। কেহই প্রাণহারিকে খুঁজিয়া পায় নাই। সুতরাং বুড়ো নিশ্চয় উপরেই আছে। অরবিন্দ বলিল, 'চল, আর একবার দোর ঠেলে দেখা যাক।'

এবার চারজনেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। বন্ধ কপাটে চাপ দিতেই কপাট খুলিয়া গেল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর প্রাণহরি পোদ্দার কাত হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার বিরলকেশ মাথার ডান পাশে লম্বা রক্তাক্ত একটা দাগ, তিনি যেন মাথার ডান দিকে সিঁথি কাটিয়া সিঁথির উপর সিঁদুর পরিয়াছেন। মুখ বিকৃত, দন্ত নিক্রান্ত; প্রাণহারি অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভেংচি কাটিতেছেন।

ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া চারজনে হুড়মুড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। তারপর একেবারে রাস্তায়।

ট্যাক্সির কাছে গিয়া দেখিল ট্যাক্সি-ড্রাইভার স্টীয়ারিং হুইলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। সকলে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরস্পরকে সাবধান করিয়া দিল, তারপর গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ড্রাইভার জাগিয়া উঠিয়া গাড়ি চালাইয়া দিল।

চারজনে যখন ক্লাবে ফিরিল তখন মাত্র নটা বাজিয়াছে। তাহারা একান্তে বসিয়া পরমার্শ করিল, কাহাকেও কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণহোরর অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ অবশ্য প্রকাশ পাইবে, কিন্তু তাহারা চারজন যে প্রাণহারির বাড়িতে গিয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা একশো গজ দূরে ছিল। সে তাঁহাদের প্রাণহোরর বাড়িতে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। সুতরাং অভিযানের কথা বেবাক চাপিয়া যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

সেদিন সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্লাবে তাস খেলিয়া তাহারা গৃহে ফিরিল। যেন কিছুই হয় নাই।

পরদিন প্রাণহারির মৃত্যু-সংবাদ শহরে রাষ্ট্র হইল বটে, কিন্তু ইহাদের চারজনের নাম হত্যার সহিত জড়িত হইল না। তৃতীয় দিন পুলিস অরবিন্দের বাড়িতে হানা দিল। পুলিস কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছে।

কিন্তু ইহারা চারজনই শহরের মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তি, তাই এখনও কাহারও হাতে দড়ি পড়ে নাই। বাহিরেও জানাজানি হয় নাই। পুলিস জোর তদন্ত চালাইয়াছে, সকলকেই একবার করিয়া ছুইয়া গিয়াছে। কখন কী ঘটে বলা যায় না। ফণীশের অবস্থা শোচনীয়। একদিকে খুনের দায়, অন্যদিকে কড়া-প্রকৃতি পিতৃদেব যদি জানিতে পারেন সে জুয়া খেলিতেছে এবং খুনের মামলায় জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে তিনি যে কী করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফণীশের কাহিনী শেষ হইতে বারোটা বাজিয়া গেল। তাহাকে আশ্বাস দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'বৌমাকে বোলো ভাবনার কিছু নেই, আমি সত্য উদঘাটনের ভার নিলাম। কাল আমরা শহরে বেড়াতে যাব, একটা গাড়ি চাই।'

ফণীশ বলিল, 'ড্রাইভারকে বলে দেব ছোট গাড়িটা আপনাদের জন্যেই মোতায়েন থাকবে।' ফণীশ চলিয়া গেল। আমরা আলো নিভাইয়া শয়ন করিলাম। নিজের খাটে শুইয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, মৃদুমন্দ টানিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বুঝলে?' ব্যোমকেশ বলিল, 'পাঁচজন আসামীর মধ্যে মাত্র একজনকে দেখেছি। বাকি চারজনকে না। দেখা পর্যন্ত কিছু বলা শক্ত।'

'পাঁচজন আসামী!'

'হাঁ। চাকরানীটাকে বাদ দেওয়া যায় না।'

আর কথা হইল না। প্রাণহরি পোদ্দারের জীবন-লীলার বিচিত্র পরিসমাপ্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

০২. সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখি

সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখি ব্যোমকেশ টেবিলে বসিয়া পরম মনোযোগের সহিত চিঠি লিখিতেছে। গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলাম, আড়মোড়া ভাঙিয়া বলিলাম, 'কাকে চিঠি লিখছি? সত্যবতীকে? দুদিন যেতে না যেতেই বিরহ চাগাড় দিল নাকি?'

ব্যোমকেশ লিখিতে লিখিতে বলিল, 'বিরহ নয়-বিকাশ।'

'বিকাশ।'

'বিকাশ দত্ত।'

'ও–বিকাশ। তাকে চিঠি লিখছ কেন?'

'বিকাশের জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করেছি। কয়লাখনির ডাক্তারখানায় আদলির চাকরি। তাই তাকে আসতে লিখছি।'

'বুঝেছি।'

ব্যোমকেশ আবার চিঠি লেখায় মন দিল। সে বিকাশকে আনিয়া কয়লাখনিতে বসাইতে চায়, নিজে দূরে থাকিয়া কয়লাখনির তত্ত্ব সংগ্রহ করিবে। আপনি রইলেন ডরপানিতে পোলারে পাঠাইলেন চর।

প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম আজ ইন্দিরার মুখ অনেকটা প্রফুল্ল; দ্বিধা সংশয়ের মেঘ ফুড়িয়া সূর্যের আলো ঝিকমিক করিতেছে। ফণীশ তাহাকে বোমকেশের আশ্বাসের কথা বলিয়াছে।

আজও আমরা দু'জনে প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেছি, দুই কত বহু পূর্বেই কর্মস্থলে চলিয়া গিয়াছেন। ব্যোমকেশ টেস্ট চিবাইতে চিবাইতে ইন্দিরার প্রতি কটাক্ষপাত করিল, বলিল, 'তোমার কতটি একেবারে ছেলেমানুষ।'

ইন্দিরা লজ্জিতভাবে চক্ষু নত করিল; তারপর তাহার চোখে আবার উদ্বেগ ও শঙ্কা ফিরিয়া আসিল। এই মেয়েটির মনে স্বামী সম্বন্ধে আশঙ্কার অন্ত নাই; ব্যোমকেশ তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল, 'ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা এখন বেরুচ্ছি।'

ইন্দিরা চোখ তুলিয়া বলিল, 'কোথায় যাকেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, ‘এই এদিক ওদিক। ফিরতে বোধ হয় দুপুর হবে। কর্তা যদি জিগ্যেস করেন, বোলো শহর দেখতে বেরিয়েছি।’

যাহার শেষ হইলে আমরা উঠিলাম। মোটর-ড্রাইভার আসিয়া জানাইল, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

গাড়িতে উঠিয়া ব্যোমকেশ ড্রাইভারকে হুকুম দিল, আগে পোস্ট-অফিসে চল।’

পোস্ট-অফিসে গিয়া চিঠিখানাতে এক্সপ্রেস ডেলিভারি টিকিট সাঁটিয়া ডাকে দিল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া ড্রাইভারকে বলিল, ‘এবার থানায় চল। সদর থানা।’

থানার সিংহদ্বারে কনস্টেবলের পাহারা। ব্যোমকেশ বড় দারোগাবাবুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে সে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিল, ‘নাম আর দরকার লিখে দিন–এত্তালা পাঠাচ্ছি।’

ব্যোমকেশ কাগজে লিখিল, ‘গগন মিত্র। মণীশ চক্রবর্তীর কয়লাখনি সম্পর্কে।’

অল্পক্ষণ পরে কনস্টেবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ‘আসুন।’

ভিতরের একটি ঘরে ইউনিফর্ম-পরা দারোগাবাবু টেবিলের সামনে বসিয়া আছেন, আমরা প্রবেশ করিলে মুখ তুলিলেন, তারপর লাফাইয়া আসিয়া ব্যোমকেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, ‘এ কি কাণ্ড! আপনি গগন মিত্র হলেন কবে থেকে।’

গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিলাম-প্রমোদ বরাট। কয়েক বছর আগে গোলাপ কলোনী সম্পর্কে কিছুদিনের জন্য ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পুলিশের চাকরি ভবঘুরের চাকরি, তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে এই শহরের সদর থানার দারোগাবাবু হইয়া আসিয়াছেন। নিকষকৃষ্ণ চেহারা এই কয় বছরে একটু ভারী হইয়াছে; মুখের ধার কিন্তু লেশমাত্র ভোঁতা হয় নাই।

সমাদর করিয়া আমাদের বসাইলেন। কিছুক্ষণ অতীত-চর্বণ চলিল, তারপর ব্যোমকেশ আমাদের এই শহরে আসার কারণ বলিল। শুনিয়া প্রমোদবাবু বলিলেন, ‘হুঁ, ফুলঝুরি কয়লাখনির কেসটা আমাদের ফাইলে আছে, কিন্তু কিছু করা গেল না। এসব কাজ পুলিসের দ্বারা ভাল হয় না; আমাদের অনেক লোক নিয়ে কাজ করতে হয়, মন্ত্রগুপ্তি থাকে না। আপনি পারবেন।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘বিকাশ দত্তকে মনে আছে? তাকে ডেকে পাঠালাম, সে কয়লাখনিতে থেকে সুলুক-সন্ধান নেবে।’

প্রমোদবাবু বলিলেন, ‘বিকাশকে খুব মনে আছে। চৌকশ ছেলে। তা আমাকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়—’

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কাছে। ও-কাজের জন্যে আমি আসিনি, প্রমোদবাবু। সম্প্রতি এখানে একটা খুন হয়েছে, প্রাণহরি পোদ্দার নামে এক বৃদ্ধ—'

'আপনি তার খবরও পেয়েছেন?'

'না পেয়ে উপায় কি! আমরা যাঁর বাড়িতে অতিথি তাঁর ছেলেই তো আপনার একজন আসামী।'

প্রমোদ বরাট মুখের একটি করুণ ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'বড় মুশকিলে পড়েছি, ব্যোমকেশবাবু। যে চারজনের ওপর সন্দেহ তারা সবাই এ শহরের হতকতা, প্রচণ্ড দাপট। তাই ভারি সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। সাক্ষী-সার্বুদ নেই, সবই circumstantial evidence, এদের কাউকে যদি ভুল করে গ্রেপ্তার করি, আমারই গর্দান যাবে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এই চারজনের মধ্যে কার ওপর আপনার সন্দেহ?'

প্রমোদবাবু ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, চারজনেরই মোটিভ সমান, চারজনেরই সুযোগ সমান। তবু মনে হয় এ অরবিন্দ হালদারের কাজ।'

'চারজনে এক জোট হয়ে খুন করতে গিয়েছিল এমন মনে হয় না?'

'না।'

'বাড়িতে একটা দাসী ছিল, তার কথা ভেবে দেখেছেন?'

'দেখেছি। তার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি কিন্তু মোটিভ খুঁজে পাইনি।'

'হুঁ। আপনি যা জানেন সব আমাকে বলুন, হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'সাহায্য করবেন আপনি? ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, ব্যোমকেশবাবু।'

অতঃপর প্রমোদ বরাট যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ এই—

যে-রাত্রে প্রাণহরি পোদ্দার মারা যান সে-রত্রে দশটার সময় উলুডাঙা কোলিয়ারির দিক হইতে একটা ট্রাক আসিতেছিল। ট্রাক-ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ি থামাইল, কারণ একটা স্ত্রীলোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে থামিতে বলিতেছে। গাড়ি থামিলে স্ত্রীলোকটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, শীগগির পুলিসে খবর দাও, এ বাড়ির মালিককে কারা খুন করেছে।'

ট্রাক-ড্রাইভার আসিয়া থানায় খবর দিল। আধঘণ্টার মধ্যে ইন্সপেক্টর বিরাট সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অকুস্থলে উপস্থিত হইলেন। মেয়েটা তখনও ব্যাকুল চক্ষে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নাম মোহিনী, প্রাণহোরর গৃহে সেই একমাত্র দাসী, অন্য কোনও ভৃত্য নাই।

ইন্সপেক্টর বরাট বাড়ির দ্বিতলে উঠিয়া লাশ দেখিলেন; তাঁহার অনুচরেরা বাড়ি খানাতল্লাশ করিল। বাড়িতে অন্য কোনও লোক নাই। মোহিনীকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল সে নীচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি কুঠুরিতে শয়ন করে; কর্তাবাবু শয়ন করেন উপরের ঘরে। আজ সন্ধ্যার সময় শহর হইতে ফিরিয়া তিনি নীচের ঘরে বসিয়া চা পান করিয়াছিলেন, তারপর উপরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। মোহিনী রান্না আরম্ভ করিয়াছিল। বাবু ন'টার পর নীচে নামিয়া আসিয়া আহার করেন, আজ কিন্তু তিনি নামিলেন না। আধঘণ্টা পরে মোহিনী উপরে ডাকিতে গিয়া দেখিল ঘরের মেঝোয়। কর্তাবাবু মরিয়া পড়িয়া আছেন।

লাশ চালান দিয়া বিরাট মোহিনীকে আবার জেরা করিলেন। জেরার উত্তরে সে বলিল, সন্ধ্যার পর বাড়িতে কেহ আসে না; কিছুদিন যাবৎ চারজন বাবু রাত্রে তাস খেলিতে আসিতেন; যেদিন তাঁহাদের আসিবার কথা সেদিন বাবু শহর হইতে মাছ মাংস কিমা ইত্যাদি কিনিয়া আনিতেন, মোহিনী তাহা রাঁধিয়া বাবুদের খাইতে দিত। আজ বাবুরা আসেন নাই, রন্ধনের আয়োজন ছিল না। বাবুরা চারজনই যুবপুরুষ, কতর্বািবুর মত বুড়ো নয়। তাঁহারা মোটরে চড়িয়া আসিতেন; সাজপোশাক হইতে তাঁহাদের ধনী বলিয়া মনে হয়। মোহিনী তাঁহাদের নাম জানে না। আজ সে যখন রান্না করিতেছিল তখন কেহ

বাড়িতে আসিয়াছিল। কিনা তাহা সে বুলিতে পারে না। বাড়িতে লোক আসিলে প্রাণহরি নীচের তলায় তাহদের সঙ্গে দেখা করিতেন, উপরের ঘরে কাহাকেও লইয়া যাইতেন না। কর্তাবাবু আজ নীচে নামেন নাই, নামিলে মোহিনী কথাবার্তর্গর আওয়াজ শুনিতে পাইত।

জেরা শেষ করিয়া বরাট বলিলেন, ‘তুমি এখন কি করবে? শহরে তোমার জানাশোনা লোক আছে?’

মোহিনী বলিল, ‘না, এখানে আমি কাউকে চিনি না।’

বরাট বলিলেন, ‘তাহলে তুমি আমার সঙ্গে চল, রাত্তিরটা থানায় থাকবে, কাল একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি মেয়েমানুষ, একলা এ বাড়িতে থাকতে পারবে কেন?’

মোহিনী বলিল, ‘আমি পারব। নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে থাকব। আমার ভয় করবে না।’

সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। বরাট একজন কনস্টেবলকে পাহারায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রাণহরি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া প্রমোদবাবু জানিতে পারিলেন, প্রাণহরি কয়লা ক্লাবের মেম্বর ছিলেন। সেখানে গিয়া খবর পাইলেন, প্রাণহরি চারজন মেম্বরের সঙ্গে নিয়মিত তাস খেলিতেন। ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হইল; এই চারজন যে প্রাণহারির বাড়িতে তাস খেলিতে যাইতেন তাহা অনুমান করা গেল।

প্রমোদবাবু চারজনকে পৃথকভাবে জেরা করিলেন। তাহারা স্বীকার করিল যে মাঝে মাঝে প্রাণহোরর বাড়িতে তাস খেলিতে যাইত, কিন্তু প্রাণহোরর মৃত্যুর রাত্রে তাহার বাড়িতে গিয়াছিল। একথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিল।

তাহাদের চারজন মোটর-ড্রাইভারকে প্রমোদ বরাট প্রশ্ন করিলেন। তিনজন ড্রাইভার বলিল সে-রাত্রে বাবুরা মোটরে চড়িয়া প্রাণহারির বাড়িতে যান নাই। কেবল একজন বলিল, বাবুরা রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় একসঙ্গে ক্লাব হইতে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু মোটরে না গিয়া পদব্রজে গিয়াছিলেন, এবং ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার একসঙ্গে কোথায় গিয়াছিলেন তাহা সে জানে না।

বরাট তখন ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের মধ্যে খোঁজ-খবর লইলেন, শহরে গোটা পঞ্চাশ ট্যাক্সি আছে। শেষ পর্যন্ত একজন ড্রাইভার অন্য একজন ড্রাইভারকে দেখাইয়া বলিল-ও সে-রাত্রে ভাড়ায় গিয়াছিল, ওকে জিজ্ঞাসা করুন। দ্বিতীয় ড্রাইভার তখন বলিল-উক্ত রাত্রে চারজন আরোহী লইয়া সে উলুডাঙা কয়লাখনির রাস্তায় গিয়াছিল। বরাট ড্রাইভারকে কয়লা ক্লাবে আনিয়া চুপিচুপি চারজনকে দেখাইলেন। ড্রাইভার চারজনকে সনাক্ত করিল।

তারপর বিরাট চারজনকে বার বার জেরা করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা অটলভাবে সমস্ত কথা অস্বীকার করিয়াছে। পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে এই যে, একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছাড়া অন্য সাক্ষী নাই; এ অবস্থায় শহরের চারজন গণ্যমান্য লোককে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা যায় না।

বয়ান শেষ করিয়া বরাট বলিলেন, 'আমি যতটুকু জানতে পেরেছি আপনাকে জানালাম। তবে একটা অবাস্তর কথা বোধ হয় আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল। অন্যতম আসামীর দাদা গোবিন্দ হালদার আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিতে এসেছিলেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ভারী কৌশলী লোক। আমাকে আড়ালে ডেকে ইশারায় জানিয়েছিলেন যে, কেসটা যদি চাপা দিই তাহলে পাঁচ হাজার টাকা বিকশিশ পাব।'

ঘড়িতে দেখিলাম বেলা সাড়ে ন'টা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার এখন কোনো জরুরী কাজ আছে কি? অকুস্থলটা দেখবার ইচ্ছে আছে।'

বরাট বলিলেন, 'বেশ তো, চলুন না।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটা এখনো ওখানেই আছে নাকি?'

বরাট বলিলেন, 'আছে বৈকি। তার কোথাও যাবার নেই, ঐ বাড়িতেই পড়ে আছে।'

তিনজনে বাহির হইলাম; প্রমোদবাবু আমাদের গাড়িতেই আসিলেন। গাড়ি চলিতে আরম্ভ কুমিল্লামকেশ ড্রাইভারকে বলল, 'যে বাড়িতে বাবুরা তাস খেলতে যেতেন সেই বাড়িতে নিয়ে চল।'

ড্রাইভারের নির্বিকার মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না, সে নির্দেশ মত গাড়ি চালাইল।

দশ মিনিট পরে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়ির সামনে মোটর থামিল। বাড়ির সদরে কেহ নাই'। বাড়িটা দেখিতে একটু উলঙ্গ গোছের; চারিপাশে পাঁচিলের বেড়া নাই, রাস্তা হইতে কয়েক হাত পিছাইয়া আকুহীনভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সদর দরজা খোলা।

বরাট ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, 'হতভাগা কনস্টেবলটা গেল কোথায়?'

বরাট আগে আগে, আমরা তাঁহার পিছনে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রান্নাঘরের দিক হইতে হেঁড়ে গলার আওয়াজ আসিতেছে। সেইদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম উর্দি-পরা পাহারাওলা গোঁফে চাড়া দিতে দিতে রান্নাঘরের দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া অন্তর্বর্তিনীর সহিত রসালাপ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

বরাট আরক্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিলেন, সে কলের পুতুলের মত স্যালুট করিল। বিরাট বলিলেন, 'বাইরে যাও। সদর দরজা খোলা রেখে তুমি এখানে কি করছ?'

বরাটের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক। অতি বড় নিরেট ব্যক্তিও বুঝিতে পারে পাহারাওলা এখানে কি করিতেছিল। মক্ষিকা মধু ভাণ্ডের কাছে কী করে?

পাহারাওলা আবার স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল। বরাট তখন রান্নাঘরের ভিতরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। মোহিনী মেঝোয় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল, ত্বরিতে উঠিয়া বরাটের পানে সপ্রশ্ননেত্রে চাহিল।

কালো মেয়েটার সারা গায়ে-মুখে চোখে অঙ্গসঞ্চালনে-কুহকভরা ইন্দ্রজাল, ভরা যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণ। যদি রঙ ফরসা হইত। তাহাকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলিত। তবু, তাহার কালো রঙের মধ্যেও এমন একটি নিশীথ-শীতল মাদকতা আছে যে মনকে আবিষ্ট করিয়া ফেলে।

কিন্তু প্রমোদ বরাট কাঠখোট্টা মানুষ, তিনি বলিলেন, ‘তুমি তাজা তরকারি পেলে কোথায়?’

মোহিনী বলিল, ‘পাহারাওলাবাবু এনে দিয়েছেন। উনি নিজের সিধে তরিতরকারি আমাকে এনে দেন, আমি রোধে দিই। আমারও হয়ে যায়।’

বরাট গলার মধ্যে শব্দ করিয়া বলিলেন, ‘হুঁ , ভারি দয়ার শরীর দেখছি পাহারাওলাবাবুর।’

মোহিনী বক্রোক্তি বুঝিল কিনা বলা যায় না, প্রশ্ন করিল, 'আমাকে কি দরকার আছে, দারোগাবাবু?'

প্রমোদবাবু বলিলেন, 'তুমি এখানেই থাকো। আমরা খানিক পরে তোমাকে ডাকব।'

'আচ্ছা।'

আমরা সদর দরজার দিকে ফিরিয়া চলিলাম। চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ স্মিতমুখে বলিল , 'আপনি একটু ভুল করেছেন, ইন্সপেক্টর বরাট। আপনার উচিত ছিল একজন বুড়ো পাহারাওলাকে এখানে বসানো।'

বরাট বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি ওদের চেনেন না। পাহারাওলারা যত বুড়ো হয় তাদের রস তত বাড়ে।'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আর সুদখোর মহাজনেরা?'

বরাট চকিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর নিম্নস্বরে বলিলেন, 'সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না, ব্যোমকেশবাবু। কিন্তু পরিস্থিতি সন্দেহজনক। আপনি মেয়েটাকে জেরা করে দেখুন না, বুড়োর সঙ্গে ওর কোনো রকম ইয়ে ছিল। কিনা।'

'দেখব।' সদর দরজার পাশে উপরে উঠিবার সিঁড়ি দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির মাথায় মজবুত ভারী দরজা, তাহাতে ইয়েল-লক লাগানো। বাড়ির অন্যান্য দরজার তুলনায় এ দরজা নূতন বলিয়া মনে হয়। হয়তো প্রাণহরি পোদ্দার বাড়ি ভাড়া লইবার পর এই ঘরে নূতন দরজা লাগাইয়াছিলেন।

বরাট পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দ্বার খুলিলেন। আমরা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তারপর বিরাট একটা জানোলা খুলিয়া দিতেই রৌদ্রোজ্জ্বল আলো ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে দু'টি জানালা দু'টি দ্বার। একটি দ্বার সিঁড়ির মুখে, অন্যটি পিছনের দেয়ালে। ঘরটি লম্বায় চওড়ায় আন্দাজ পনেরো ফুট চৌকশ।। ঘরে আসবাব বিশেষ কিছু নাই; একটা তক্তপোশের উপর বিছানা, তাহার শিয়রের দিকে দেয়াল ঘোষিয়া একটি জগদ্দল লোহার সিন্দুক। একটা দেয়াল-আলনা হইতে প্রাণহারির ব্যবহৃত জামা কাপড় ঝুলিতেছে। প্রাণহারির টাকার অভাব ছিল না, কিন্তু জীবন যাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্ত মামুলী। মাথার কাছে লোহার সিন্দুক লইয়া দরজায় ইয়েল-লক লাগাইয়া তিনি তক্তপোশের মলিন শয্যায় শয়ন করিতেন।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু চক্ষু বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'লাশ কোথায় ছিল?'

সিঁড়ির দরজা হইতে হাত চারেক দূরে মেঝের দিকে আঙুল দেখাইয়া বরাট বলিলেন, 'এইখানে।'

ব্যোমকেশ নত হইয়া স্থানটা পরীক্ষা করিল, বলিল, 'রিক্তের দাগ তো বিশেষ দেখছি না। সামান্য ছিটেফোঁটা।'

বরাট বলিলেন, 'বুড়োর গায়ে কি রক্ত ছিল! চেহারাটা ছিল বেউড় বাঁশের মত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অবশ্য মাথার খুলি ভাঙলে বেশি রক্তপাত হয় না।–মারণাস্ত্রটা পাওয়া গেছে?'

না। ঘরে কোন অস্ত্র ছিল না। বাড়িতেও এমন কিছু পাওয়া যায়নি যাকে মারণাস্ত্র মনে করা ঘোড় পারে। বাড়ির চারপাশে বহু দূর পর্যন্ত খুঁজে দেখা হয়েছে, মরনাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

'যাক। সিন্দুক খুলে দেখেছিলেন নিশ্চয়। কি পেলেন?'

'সিন্দুকের চাবি পোদ্দারের কোমরে ছিল। সিন্দুক খুলে পেলাম হিসেবের খেরো-বাঁধানো খাতা আর নগদ দশ হাজার টাকা।'

'দশ হাজার টাকা।'

'হ্যাঁ। বুড়োর মহাজনী কারবার ছিল তাই বোধহয় নগদ টাকা কাছে রাখতো।'

'হুঁ। ব্যাঙ্কে টাকা ছিল?'

'ছিল। এবং এখনো আছে। কে পাবে জানি না। টাকা কম নয়, প্রায় দেড় লাখ।'

'তাই নাকি! আত্মীয়-স্বজনরা খবর পেয়েছে?'

'বোধহয় কেউ নেই। থাকলে শকুনির পালের মত এসে জুটত।'

'শহরে বুড়োর একটা অফিস ছিল শুনেছি। সেখানে তল্লাশ করে কিছু পেয়েছিলেন?'

'অফিস মানে চোর-কুটুরির মত একটা ঘর।–দু' চারটে খাতাপাত্তর ছিল, তা থেকে মনে হয় মহাজনী কারবার ভাল চলত না।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে কতকটা নিজমনেই বলিল, 'মহাজনী কারবার ভাল চলত না, অথচ ব্যাঙ্কে দেড় লাখ এবং সিন্দুকে দশ হাজার-চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে বলিল, 'ওই অন্য দরজাটার বাইরে কি আছে?'

বরাট বলিলেন, 'স্নানের ঘর ইত্যাদি।'

এ দরজাটাও নূতন মজবুত দরজা। প্রাণহরি পোদ্দার ঘরটিকে দুর্গের মত সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, কারণ সিন্দুকে মাল আছে।

ব্যোমকেশ দরজা খুলিল। সঙ্কীর্ণ ঘরে পিছনের দেয়ালে একটি ঘুলঘুলি দিয়া আলো আসিতেছে, ঘুলঘুলির নীচে সরু একটি দরজা। ঘরে একটি শূন্য বালতি ও টিনের মগ ছাড়া আর কিছু নাই।

সরু দরজার উপরে-নীচে ছিটুকিনি লাগানো। ব্যোমকেশ ছিটুকিনি খুলিয়া কপাট ফাঁক করিল। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, দ্বারের মুখ হইতে শীর্ণ লোহার। মই মাটি পর্যন্ত গিয়াছে। মেথরখাটা রাস্তা; প্রাণহারির দুর্গে প্রবেশ করিবার দ্বিতীয় পথ।

ব্যোমকেশ বরাটকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি সে-রাত্রে যখন প্রথম এসেছিলেন, এ দরজা দুটো বন্ধ ছিল?'

বরাট বলিলেন, 'হ্যাঁ, দুটোই বন্ধ ছিল। কেবল সামনে সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল।' ব্যোমকেশ বলিল, চলুন, এবার নীচে যাওয়া যাক। মেয়েটাকে দুচারটে প্রশ্ন করে দেখি।'

ড্রয়িং-রুমের মত সাজানো নীচের তলার যে-ঘরটাতে তাস খেলা হইত। সেই ঘরে আমরা বসিয়াছি। মোহিনী একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্ন নাই, ভাবভঙ্গী বেশ সংযত এবং সংবৃত।

মনে মনে প্রাণহারির নিরাভরণ শয়নকক্ষের সহিত সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমের তুলনা করিতেছি, ব্যোমকেশ মোহিনীকে প্রশ্ন করিল, 'তুমি প্রাণহারিবাবুর কাছে কতদিন চাকরি করছ?'

মোহিনী বলিল, 'দুবছরের বেশি।'

'প্রাণহারিবাবু যখন কটকে ছিলেন তখন থেকে তুমি ওঁর কাছে আছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'প্রাণহারিবাবুর আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে?'

'জানি না। কখনো দেখিনি।'

'তুমি কত মাইনে পাও?'

'কটকে ছিল দশ টাকা মাইনে আর খাওয়া-পরা। এখানে আসার পর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

'প্রাণহরিবাবু কেমন লোক ছিলেন?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মোহিনী বলিল, 'তিনি আমার মালিক ছিলেন, ভাল লোকই ছিলেন।' অর্থাৎ, তিনি আমার মালিক ছিলেন তাঁহার নিন্দা করিব না, তোমরা বুঝিয়া লও।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি কৃপণ ছিলেন?'

মোহিনী চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ স্থিরনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি রকম ছিল?

মোহিনী একটু বিস্ময়ভরে ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল, তাহার ঠোঁটের কোণে যেন একটু চটুলতার ঝিলিক খেলিয়া গেল। তারপর সে শান্তস্বরে বলিল, 'ভালই ছিল। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। তাঁর স্ত্রীলোক-ঘটিত কোনো দোষ ছিল?'

'আজ্ঞে না। বুড়োমানুষ ছিলেন, ওসব দোষ ছিল না। কেবল তাস খেলার নেশা ছিল। একলা বসে বসে তাস খেলতেন।'

'যাক। তুমি এখন নিজের কথা বল। প্রাণহারিবাবু খুন হয়েছেন, তা সত্ত্বেও তুমি একলা এ বাড়িতে পড়ে আছ কেন?

'কোথায় যাব? এ শহরে তো আমার কেউ নেই।'

'দেশে ফিরে যাচ্ছ না কেন?'

'তাই যাব। কিন্তু দারোগাবাবু হুকুম দিয়েছেন যতদিন না খুনের কিনারা হয় ততদিন কোথাও যেতে পার না।'

'দেশে তোমার কে আছে।'

'বুড়ো মা-বাপ আছে।'

'আর স্বামী?

মোহিনী চকিতে চোখ তুলিয়া আবার চোে‌খ নীচু করিয়া ফেলিল, প্রশ্নের উত্তর দিল না।

‘বিয়ে হয়েছে নিশ্চয়?’

মোহিনী নীরবে ঘাড় নাড়িল।

‘স্বামী কোথায়?’

মোহিনী ঘাড় তুলিয়াই ধীরে ধীরে উত্তর দিল, ‘স্বামী ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে, আর ফিরে আসেনি।’

ব্যোমকেশ তাহার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া সিগারেট ধরাইল, ‘কতদিন হল স্বামী ঘরছাড়া হয়েছে?’

‘তিন বছর।’

‘স্বামী কী কাজ করত?

‘কল-কারখানায় কাজ করত।’

‘বিবাগী হয়ে গেল কেন?’

মোহিনীর অধরোষ্ঠ একটু প্রসারিত হইল, সে ব্যোমকেশের প্রতি একটি চকিত চপল কটাক্ষ হানিয়া বলিল, 'জানি না।'

ইহাদের প্রশ্নোত্তর শুনিতে শুনিতে এবং মোহিনীকে দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছি, মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র কেমন? সচ্চরিত্রা, না স্বৈরিণী? সে যে-শ্রেণীর মেয়ে তাহদের মধ্যে একনিষ্ঠা ও পতিব্রত্যের স্থান খুব উচ্চ নয়। ঐহিক প্রয়োজনের তাড়নায় তাহাদের জীবন বিপথে-কুপথে সঞ্চরণ করে। অথচ মোহিনীকে দেখিয়া ঠিক সেই জাতীয় সাধারণ বি-চাকরানী শ্রেণীর মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। কোথায় যেন একটু তফাৎ আছে। তাহার যৌবন-সুলভ চপলতা চটুলতার সঙ্গে চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহস আছে। এ মেয়ে যদি নষ্ট-দুষ্ট হয়, সজ্ঞানে জানিয়া বুঝিয়া নষ্ট-দুষ্ট হইবে, বাহ্য প্রয়োজনের তাগিদে নয়।

ব্যোমকেশ সিগারেটে দুটা লম্বা টান দিয়া বলিল, 'যে চারজন বাবু এখানে তাস খেলতে আসতেন তাঁদের তুমি কয়েকবার দেখেছি–কেমন?

মোহিনীর চক্ষু দু'টি একবার দক্ষিণে-বামে সঞ্চরণ করিল, অধরোষ্ঠ ক্ষণকাল বিভক্ত হইয়া রহিল, যেন সে হাসিতে গিয়া থামিয়া গেল। তারপর বলিল, 'হ্যাঁ, কয়েকবার দেখেছি।' সে বুঝিয়াছে ব্যোমকেশের প্রশ্ন কোন দিকে যাইতেছে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওদের মধ্যে কে কেমন লোক তুমি বলতে পার?'

অব্যক্ত হাসি এবার পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মোহিনী একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, 'কে কেমন মানুষ তা কি মুখ দেখে বলা যায় বাবু? তবে একজন ছিলেন সবচেয়ে ছেলেমানুষ আর সবচেয়ে ভালোমানুষ। বাকি তিনজন'–সে থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, বাকি তিনজন কেমন লোক?'

হাসিমুখে জিভ কাটিয়া মোহিনী বলিল, 'আমি জানি না বাবু।'

মোহিনীর একটা ক্ষমতা আছে, সে জানি না' বলিয়া অনেক কথা জানাইয়া দিতে পারে।

ব্যোমকেশ সিগারেটের দগ্ধাংশ জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এঁরা তাস খেলার সময় ছাড়াও অন্য সময়ে আসতেন কি?'

মোহিনী কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, 'একজন আসতেন। কর্তাবাবু সকালবেলা আপিস চলে যাবার পর আসতেন।'

'নাম জানি না বাবু। কালো মোটা মত চেহারা, খুব ছেঁদো কথা বলতে পারেন।'

বরাট অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'অরবিন্দ হালদার।'

ব্যোমকেশ মোহিনীকে বলিল, 'তাহলে তোমার সঙ্গেই তিনি দেখা করতে আসতেন?'

মোহিনী কেবল ঘাড় নাড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল, ‘কোনো প্রস্তাব করেছিলেন?’

মোহিনীর দৃষ্টি হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল, ‘সে তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, ‘সোনার আংটি দিতে এসেছিলেন, সিল্কের শাড়ি দিতে এসেছিলেন।’

‘তুমি নিয়েছিলে?’

না। আমার ইজৎ অত সস্তা নয়।’

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাহাকে নিবিষ্টচক্ষে নিরীক্ষণ করিল, তারপর বলিল, ‘আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। পরে যদি দরকার হয়। আবার সওয়াল করব। —তুমি উড়িষ্যার মেয়ে, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলতে পারো দেখছি।’

সুন্টু সুব এবার নরম হইল। সে বলিল, ‘বাবু, আমি ছেলেবেলা থেকে বাঙালীর বাড়িতে কাজ করেছি।’

ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিলাম, মোহিনী-বর্ণিত ছেলেমানুষ এবং ভালোমানুষ লোকটি অবশ্য ফণীশ। অন্য তিনজনের মধ্যে অরবিন্দ হালদার দু’কান-কাঁটা লম্পট। আর বাকি

দু'জন? বোধ হয় অতটা বেহায়া নয়, কিন্তু মনে লোভ আছে; ডুবিয়া ডুবিয়া জল পান করেন। মোহিনী বলিয়াছিল, তাহার ইজ্জৎ অত সস্তা নয়। তাহার ইজ্জতের দাম কত? রূপযৌবনের অনুপাতেই কি ইজ্জতের দাম বাড়ে এবং কমে? কিংবা অন্য কোনও নিরিখ আছে? এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই দিতে পারেন।

থানার সামনে বিরাট নামিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওবেলা আবার আসব। সিভিল সার্জন-যিনি আটপ্সি করেছেন—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

বরাট বলিলেন, 'আসবেন। আমি সিভিল সার্জনের সঙ্গে সময় ঠিক করে রাখব। পি এম রিপোর্ট অবশ্য তৈরি আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পি এম রিপোর্টও দেখব।'

বরাট বলিলেন, 'আচ্ছা। চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করে রাখব।'

বাড়ি ফিরিলাম তখন বারোটা বাজিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে মণীশবাবুরা ফিরিলেন। মণীশবাবু ভ্রূ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলে সে বলিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যা করবার আমি করছি। পুলিসের সঙ্গে দেখা করেছি। একটা ব্যবস্থা হয়েছে, পরে আপনাকে সব জানাবো।'

মণীশবাবু সন্তুষ্ট হইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। ফণীশ উৎসুকভাবে আমাদের আশেপাশে ঘুর ঘুর করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'তুমিও নিশ্চিন্ত থাকো, কাজ খানিকটা এগিয়েছে। বিকেলে আবার বেরুব।'

বেলা তিনটের সময় পিতাপুত্র আবার কাজে বাহির হইলেন। আমরা সুরপতি ঘটকের দপ্তরে গেলাম। সুরপতিবাবু আমাদের অফিস-ঘরে বসাইয়া কয়লাখনি চালানো সম্বন্ধে নানা তথ্য শুনাইতে লাগিলেন। তারপর দ্বারদেশে দুইটি যুবকের আবির্ভাব ঘটিল। খদ্দর-পরা শান্তশিষ্ট চেহারা, মুখে বুদ্ধিমত্তার সহিত বিনীত ভাব। সুরপতিবাবু বলিলেন, 'এই যে তোমরা এসেছ! গগনবাবু, এদেরই কথা আপনাকে বলেছিলাম। ওরা দুই ভাই, নাম বিশ্বনাথ আর জগন্নাথ। ওদের আমি নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছি। বয়স কম বটে, কিন্তু কাজকর্মে একেবারে পোক্ত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। এখানকার কাজ ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে আপনাদের আপত্তি নেই তো?'

বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ মাথা নাড়িয়া জানাইল, আপত্তি নাই। সুরপতিবাবু বলিলেন, 'ওদের দু'জনকে কিন্তু একসঙ্গে ছাড়তে পারব না, তাহলে আমার কাজের ক্ষতি হবে। ওদের মধ্যে একজনকে আপনারা নিন, যাকে আপনাদের পছন্দ।'

'তাই সই বলিয়া ব্যোমকেশ পকেট হইতে নোটবুক বাহির করিয়া দু'জনের নাম-ধাম লিখিয়া লইল, বলিল, 'যথাসময় আমি আপনাকে চিঠি দেব।'

বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ সুরপতিবাবুকে বলিল, দু'জনকেই আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি যাকে দিতে চান তাকেই নেব।'

সুরপতিবাবু খুশি হইয়া বললেন, 'ওরা দুই ভাই সমান কাজের লোক, আপনার যাকেই নিন ঠকবেন না।'

চারটে বাজিতে আর দেরি নাই দেখিয়া আমরা উঠিলাম।

বরাট অফিসে ছিলেন, বলিলেন, 'সিভিল সার্জন সাড়ে চারটার সময় দেখা করবেন। এই নিন পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট।'

ব্যোমকেশ রিপোর্টে চোখ বুলাইয়া ফেরৎ দিল। তারপর আমরা হাসপাতালের দিকে রওনা হইলাম। সিভিল সার্জন মহাশয়ের অফিস হাসপাতালে।

সিভিল সার্জন বিরাজমোহন ঘোষাল অফিসে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন। বয়স্থ ব্যক্তি, স্কুল গৌরবর্ণ সুদর্শন চেহারা, আমাদের দেখিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'আপনার আসল নাম আমি জেনে ফেলেছি, ব্যোমকেশবাবু। ইন্সপেক্টর বরাট ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধাপ্পা টিকল না।' বলিয়া আবার অট্টহাস্য করিলেন।

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল, 'বে-কায়দায় পড়ে পঞ্চ পাণ্ডবকে ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিল, আমি তো সামান্য লোক। একটা গোপনীয় কাজে এখানে এসেছি, তাই গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে।'

'ভয় নেই, আমার পেট থেকে কথা বেরুবে না। বসুন।'

কিছুক্ষণ সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা হাস্য-পরিহাস চলিল। ডাক্তার ঘোষাল আনন্দময় পুরুষ, সারা জীবন মড়া ঘাঁটিয়াও তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত অট্টহাস্য প্রশমিত হয় নাই।

অবশেষে কাজের কথা আরম্ভ হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রাণহরি পোদ্দারের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট আমি দেখেছি। আপনার মুখে অতিরিক্ত কিছু শুনতে চাই। লোকটি বুড়ো হয়েছিল, রোগা-পাটকা ছিল, তার দৈহিক শক্তি কি কিছুই অবশিষ্ট ছিল না?'

বিরাজবাবু বলিলেন, 'দৈহিক শক্তি—'

'মানে–যৌবন। পুরুষের যৌবন অনেক বয়স পর্যন্ত থাকতে পারে; একশো বছর বয়সে ছেলের বাপ হয়েছে এমন নজিরও পাওয়া যায়। প্রাণহরি পোদ্দারের দেহ-যন্ত্রটা সেদিক দিয়ে কি সক্ষম ছিল?'

বিরাজবাবু আবার অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, 'ও-এই কথা জানতে চান? তা ডাক্তারের কাছে এত লজ্জা কিসের? না, প্রাণহরি পোদ্দারের শরীরে রস-কষ কিছু ছিল না, একেবারে শুষ্কং'কাষ্ঠং।' দু'বার গড়গড়ায় টান দিয়া বলিলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি। যারা রাতদিন টাকার ভাবনা ভাবে তাদের ওসব বেশি দিন থাকে না। প্রাণহরি পোদ্দার তো সুদখোর মহাজন ছিল।'

মনে হইল ব্যোমকেশ একটু নিরাশ হইয়াছে। ক্ষণেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া সে বলিল , 'আচ্ছা, ওকথা যাক। এখন মারণাস্ত্রের কথা বলুন। খুলির ওপর ওই একটা চোটু ছাড়া আর কোথাও আঘাতের দাগ ছিল না?'

'না।'

'এক আঘাতেই মৃত্যু ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'অস্ত্রটা কী ধরনের ছিল?'

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ গড়গড়া টানিলেন, 'কী রকম অস্ত্র ছিল বলা শক্ত। অস্ত্রটা লম্বা গোছের, লম্বা এবং ভারী। কাটারির মত ধারালো নয়, আবার পুলিসের রুলের মত ভোঁতাও নয়—'

ব্যোমকেশ বলিল, ইলেকট্রিক টর্চ হতে পারে কি?'

'ইলেকট্রিক টর্চ!' বিরাজবাবু মাথা নাড়িলেন, 'না, তাতে এমন পরিষ্কার কাটা দাগ হবে না। এই ধরুন, কাটারির ফলার উল্টো পিঠ দিয়ে, অর্থাৎ শিরদাঁড়ার দিক দিয়ে যদি সজোরে মাথায় মারা যায় তাহলে ওইভাবে খুলির হাড় ভাঙতে পারে।'

'রান্নাঘরের হাতা বেড়ি খুন্তি-?'

'না, তার চেয়ে ভারী জিনিস।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'অস্ত্রটাই ভাবিয়ে তুলেছে। যাদের ওপর সন্দেহ তারা দা-কাটারি জাতীয় অস্ত্র নিয়ে খুন করতে গিয়েছিল ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে একেবারে অসম্ভব নয়। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আততায়ী সামনের দিক থেকে অস্ত্র চালিয়েছিল, না পিছন দিক থেকে?'

বিরাজবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'সামনের দিক থেকে। কপাল থেকে মাথার মাঝখান পর্যন্ত হাড় ভেঙেছে, পিছন দিকের হাড় ভাঙেনি।'

'পিছন দিক থেকে মারা একেবারেই সম্ভব নয়?'

বিরাজবাবু ভাবিয়া বলিলেন, 'পোদ্দার যদি চেয়ারে বসে থাকত তাহলে ওভাবে মারা সম্ভব। হত, দাঁড়িয়ে থাকলে সম্ভব নয়। তবে যদি আততায়ী দশ ফুট লম্বা হয়—

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'দশ ফুট দ্রাঘিমার লোক এখানে থাকলে নজরে পড়ত। আচ্ছা, আজ চলি। নমস্কার।'

থানায় ফিরিয়া বরাট বলিলেন, 'অতঃপর? বাকি তিনজন আসামীকে দর্শন করতে চান?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চাই বৈকি। এখন তাদের বাড়িতে পাওয়া যাবে?'

বরাট বলিলেন, 'না, এসময় তারা খেলাধুলো করতে ক্লাবে আসে।'

'তাহলে এখন থাক। আপনার সঙ্গে ক্লাবে গেলে শিকার ভড়কে যাবে! ভাল কথা, পোদ্দারের হিসেবের খাতাটা দিতে পারেন? ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে চাই, যদি কিছু পাওয়া যায়।'

'অফিসেই আছে, নিয়ে যান। আর কিছু?'

'আর-একটা কাজ করলে ভাল হয়। প্রাণহরি পোদ্দারের অতীত সম্বন্ধে কিছুই জানা দুই দেড়েক আগে বুড়ে কটকে ছিল। কটকের পুলিস দপ্তর থেকে কিছু খবর পাওয়া যায় না-কি?'

বরাট বলিলেন, ‘কটকের পুলিস দপ্তরে খোঁজ নিয়েছিলাম, প্রাণহরি পোদ্দারের পুলিস-রেকর্ড নেই। তবে তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে যদি জানতে চান, আমার একজন চেনা অফিসার কয়েক বছর কটকে আছেন-ইন্সপেক্টর পট্টনায়ক। তাঁকে লিখতে পারি।’

‘তাই করুন। ইন্সপেক্টর পট্টনায়ককে টেলিগ্রাম করে দিন, যত শীগগির খবর পাওয়া যায়। আজ উঠলাম, কাল সকালেই আবার আসছি।’

০৩. নৈশ ভোজনের পর

নৈশ ভোজনের পর মণীশবাবু উপরে চলিয়া গেলেন, আমরা নিজেদের ঘরে আসিলাম। মাথার উপর পাখা খুলিয়া দিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিলাম, ব্যোমকেশ কিন্তু শুইল না, প্রাণহোরর হিসাবের খাতা লইয়া টেবিলের সামনে বসিল। খেরো-বাঁধানো দুভাঁজ করা লম্বা খাতা, তাহাতে দেশী পদ্ধতিতে হিসাব লেখা।

ব্যোমকেশ হিসাবের খাতার গোড়া হইতে ধীরে ধীরে পাতা উল্টাইতেছে, আমি খাটের ধারে বসিয়া সিগারেট প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি, এমন সময় ফণীশ আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিল, তারপর এক অদ্ভুত কাজ করিল। তাহার সামনে টেবিলের উপর একটি কাচের কাগজ-চাপা গোলক ছিল, সে চকিতে তাহা তুলিয়া লইয়া ফণীশের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

ফণীশ টপ করিয়া সেটা ধরিয়া ফেলিল, নচেৎ মেঝেয় পড়িয়া চুর্ণ হইয়া যাইত। ব্যোমকেশ হাসিয়া ডাকিল, 'এস ফণীশ।'

ফণীশ বিস্মিত হতবুদ্ধি মুখ লইয়া কাছে আসিল, ব্যোমকেশ কাচের গোলাটা তাহার হাত হইতে লইয়া বলিল, 'অবাক হয়ে গেছ দেখছি। ও কিছু নয়, তোমার রিফ্লেক্স পরীক্ষা করছিলাম। বোসো, কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

ফণীশ সামনের চেয়ারে বসিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি আজকাল ক্লাবে যাও না?'

ফণীশ বলিল, 'ওই ব্যাপারের পর আর যাইনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাওনি কেন? হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'

ফণীশ বলিল, 'আচ্ছা, কাল থেকে যাব।'

'আমরাও যাব। অতিথি নিয়ে যেতে বাধা নেই তো?'

'না। কিন্তু—ক্লাবে আপনার কিছু দরকার আছে কি?'

'তোমার তিন বন্ধুকে আড়াল থেকে দেখতে চাই।–আচ্ছা, একটা কথা বল দেখি, সেদিন তোমরা যে প্রাণহরি পোদ্দারকে ঠেঙাতে গিয়েছিলে তোমাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছু ছিল?'

'অস্ত্র ছিল না। তবে মধুময়বাবুর হাতে একটা লম্বা টর্চ ছিল, মুণ্ডুওয়ালা টর্চ। আর মৃগাঙ্কবাবুর হাতে ছিল বেতের ছড়ি।'

'কি রকম ছড়ি? মোটা, না লচপচে?

লচপাচে। যাকে swagger came বলে।'

‘হুঁ, তোমার হাতে কিছু ছিল না?’

‘না।’

‘অরবিন্দ হালদারের হাতে?’

‘না।’

‘কাপড়-চোপড়ের মধ্যে লোহার ডাণ্ডা কি ঐরকম কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল?’

‘না। গরমের সময়, সকলের গায়েই হাল্কা ড্রাম-কাপড় ছিল, ধুতি আর পাঞ্জাবি। কারুর সঙ্গে ওরকম কিছু থাকলে নজরে পড়ত।’

‘ই—ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া কিছুক্ষণ টানিল, শেষে বলিল, কোথা দিশা খুঁজে পাই না। তুমি যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে। —কবিতা আওড়াতে পারো? বৌমাকে বোলো-নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।’

ফণীশ লজ্জিত মুখে চলিয়া গেল। আমি শয়ন করিলাম। ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ খাতা দেখিল, তারপর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

অন্ধকারে প্রশ্ন করিলাম, ‘খুব তো কবিতা আওড়াচ্ছ, আজ সারাদিনে কিছু পেলে?’

উত্তর আসিল, 'তিনটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। এক-প্রাণহরি পোদ্দারকে যিনি খুন করেছেন তাঁর টাকার লোভ নেই; দুই-তিনি সব্যসাচী; তিন-মোহিনীর মত মেয়ের জন্য যে-কেউ খুন করতে পারে।–এবার ঘুমিয়ে পড়।'

সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ আবার হিসেবের খাতা লইয়া বসিয়াছে।

তারপর যথাসময়ে প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ হিসাবের খাতটি সঙ্গে লইল।

থানায় পৌঁছিলে ইন্সপেক্টর বিরাট হাসিয়া বলিলেন, 'এরই মধ্যে হিসেবের খাতা শেষ করে ফেললেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ খাতায় মাত্র দেড় বছরের হিসেব আছে, অর্থাৎ এখানে আসার পর প্রাণহরি নতুন খাতা আরম্ভ করেছিল।'

বরাট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিছু পেলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনের ওপর আলোকপাত করে এমন কিছু পাইনি। কিন্তু একটা সামান্য বিষয়ে খাটুকা লেগেছে।'

‘কী বিষয়?’

‘একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে প্রাণহারির ব্যবস্থা ছিল, সে রোজ তাকে ট্যাক্সিতে বাড়ি থেকে নিয়ে আসত, আবার বাড়ি পৌঁছে দিত। মাসিক ভাড়া দেবার ব্যবস্থা ছিল নিশ্চয়। কিন্তু হিসেবের খাতায় দেখছি ঠিক উল্টো। এই দেখুন খাতা।’ ব্যোমকেশ খাতা খুলিয়া দেখাইল। খাতার প্রতি পৃষ্ঠায় পাশাপাশি জমা ও খরচের স্তম্ভ। খরচের স্তম্ভে এক পয়সা দুই পয়সার খরচ পর্যন্ত লেখা আছে, কিন্তু জমার স্তম্ভ। অধিকাংশ দিনই শূন্য। মাঝে মাঝে কোনও খাতক সুদ জমা দিয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। ব্যোমকেশ আঙুল দিয়া দেখাইল, ‘এই দেখুন, ৩রা মাঘ জমার কলমে লেখা আছে, ট্যাক্সি-ড্রাইভার ৩৫ টাকা। এমনি প্রত্যেক মাসেই আছে। কিন্তু খরচের কলমে ট্যাক্সি বাবদ কোনো খরচের উল্লেখ নেই।’

হয়তো ভুল করে খরচটা জমার কলমে লেখা হয়েছিল।’

‘প্রত্যেক মাসেই কি ভুল হবে?

‘হুঁ। আপনার কি মনে হয়?’

‘বুঝতে পারছি না। খাতায় জুয়া খেলার লাভ-লোকসানের হিসেবও নেই। একটু রহস্যময় মনে হয় না কি?’

'তা মনে হয় বৈকি। এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে?'

ব্যোমকেশ ভাবিয়া বলিল, 'প্রাণহরি যার ট্যাক্সিতে যাতায়াত করত তাকে পেলে সওয়াল জবাব করা যায়। তাকে চেনেন নাকি?'

বরাট বলিলেন, 'না, তার খোঁজ করা দরকার মনে হয়নি। এক কাজ করা যাক, ভুবন দাসকে ডেকে পাঠাই, সে নিশ্চয় সন্ধান দিতে পারবে।'

'ভুবন দাস?' -

'সো-রাত্রে ওদের চারজনকে যে ট্যাক্সি-ড্রাইভার প্রাণহারির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তার নাম ভুবনেশ্বর দাস।'

'ও-তাকে কি পাওয়া যাবে?

'কাছেই ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড। আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।'

পনেরো মিনিট পরে ভুবনেশ্বর দাস আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল। দোহারা চেহারা, খাকি প্যান্টুলুন ও শার্ট, মাথায় গার্ডসাহেবের মত টুপি। বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ, চোখ দু'টি অরুণাভ, মুখ গভীর। সন্দেহ হইল লোকটি নেশাভাঙা করিয়া থাকে।

বরাট ঘাড় নাড়িয়া ব্যোমকেশকে ইঙ্গিত করিলেন, ব্যোমকেশ ভুবন দাসকে একবার আগাপাস্তলা দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল, 'তোমার নাম ভুবন দাস। মিলিটারিতে ছিলে?'

ভুবন দাস বলিল, 'আজ্ঞে।'

'সিপাহী ছিলে?

'আত্তে না, ট্রাক-ড্রাইভার।'

'ট্যাক্সি চালাচ্ছে কত দিন?'

'তিন-চার বছর।'

'তিন-চার বছর এখানেই ট্যাক্সি চালোচ্ছ?

'আজ্ঞে না, এখানে বছর দেড়েক আছি, তার আগে কলকাতায় ছিলাম।'

'বাড়ি কোথায়?'

‘মেদিনীপুর জেলা, ভগবানপুর গ্রাম।’

‘তুমি সেদিন চারজনকে নিয়ে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়িতে গিয়েছিলে?’

‘আজ্ঞে বাড়িতে নয়, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে।’

‘বেশ। তোমার ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেছিল?’

ভুবন দাস একটু নীরব থাকিয়া বলিল, ‘বলেছিল। আমি সব কথায় কান করিনি।’

ব্যোমকেশ বলিল, কিছু মনে আছে?’

ভুবন দাস আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ‘বোধ হয় কোনো মেয়েলোকের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। চাপা গলায় কথা হচ্ছিল, ভাল শুনতে পাইনি।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আচ্ছা যাক। বল দেখি, তোমার চারজন যাত্রীর কারুর হাতে কোনো অস্ত্র ছিল?’

‘একজনের হাতে ছড়ি ছিল।’

‘আর কারুর হাতে কিছু ছিল না?’

'লক্ষ্য করিনি।'

'তুমি নেশা করা?'

'আজ্ঞে না বলিয়া ভুবন দাস ইন্সপেক্টর বরাটের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিল।

'শহরে তোমার বাসা কোথায়?'

'বাসা নেই। রাত্তিরে গাড়িতেই শুয়ে থাকি।'

'গাড়ি তোমার নিজের?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শহরের অন্য ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে তোমার নিশ্চয় জানাশোনা আছে।'

'জানাশোনা আছে, বেশি মেলামেশা নেই।'

বলতে পারো, কার ট্যাক্সিতে চড়ে প্রাণহরি পোদ্দার শহরে যাওয়া-আসা করতেন?

মনে হইল। ভুবন দাসের রক্তাভ চোখে একটু কৌতুকের ঝিলিক খেলিয়া গেল। সে কিন্তু গম্ভীর স্বরেই বলিল, 'আজ্ঞে স্যার, আমার ট্যাক্সিতে।'

আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তারপর বিরাট কড়া সুরে বলিলেন, 'একথা আগে আমাকে বলনি কেন?'

ভুবন বলিল, 'আপনি তো সুধোননি স্যার।'

ব্যোমকেশ হাসি চাপিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল। ট্যাক্সি-ড্রাইভার সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা খুব বিস্তীর্ণ নয়, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি তাহারা অতিশয় স্বল্পভাষী জীব, অকারণে বাক্য ব্যয় করে না। অবশ্য ভাড়া লইয়া ঝগড়া বাধিলে স্বতন্ত্র কথা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি তাহলে প্রাণহরি পোদ্দারকে আগে থাকতেই চিনতে?

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে।'

'তিনি কি রকম লোক ছিলেন?'

'ভাল লোক ছিলেন স্যার, কখনো ভাড়ার টাকা ফেলে রাখতেন না।' ভুবনের কাছে ইহাই সাধুতার চরম নিদর্শন।

‘রোজ নগদ ভাড়া দিতেন?’

‘আজ্ঞে না, মাস-মাইনের ব্যবস্থা ছিল।’

‘কত টাকা মাস-মাইনে?’

‘পঁয়ত্রিশ টাকা।’

বরাটের সহিত ব্যোমকেশ মুখ-তাকাত কি করিল, তারপর ভুবনকে বলিল, ‘প্রাণহরি পোদ্দারের সম্বন্ধে তুমি কী জানো সব আমায় বল।’

ভুবন বলিল, ‘বেশি কিছু জানি না। স্যার। শহরে ওঁর একটা অফিস আছে। বছরখানেক আগে উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে মাস-মাইনেতে ট্যাক্সি ভাড়া করার কথা তোলেন, আমি রাজী হই। তারপর থেকে আমি ওঁকে সকালে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতাম, আবার বিকেলবেলা পৌঁছে দিতাম। বাংলা মাসের গোড়ার দিকে উনি আমাকে অফিসে ডেকে ভাড়া চুকিয়ে দিতেন। এর বেশি ওঁর বিষয়ে আমি কিছু জানি না।’

‘তুমি মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাস-মাইনেতে রাজী হয়েছিলে? লাভ থাকতো?’

‘সামান্য লাভ থাকতো। বাঁধা ভাড়াটে তাই রাজী হয়েছিলাম।’

ব্যোমকেশ খানিক চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল, 'অন্য কোনো ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে প্রাণহারিবাবুর কারবার ছিল কিনা জানো?'

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে, আমি জানি না।'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যাও। যদি প্রাণহরি সম্বন্ধে কোনো কথা মনে পড়ে দারোগাবাবুকে জানিও।'

'আজ্ঞে।' ভুবন দাস স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল।

তিনজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিলাম। তারপর বরাট বলিলেন, 'কিছুই তো পাওয়া গেল না। হিসেবের খাতায় হয়তো ভুল করেই খরচের জায়গায় জমা লেখা হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিংবা সাংকেতিক জমা-খরচ।'

ভ্রূ তুলিয়া বরাট বলিলেন, 'সাংকেতিক জমা-খরচ কি রকম?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মনে করুন প্রাণহরি পোদ্দার কাউকে ব্ল্যাকমেলা করছিল। ভুকন দাস তাকে যত ভাল লোকই মনে করুক আমরা জানি সে প্যাঁচালো লোক ছিল। মনে করুন। সে মাসিক সত্তর টাকা হিসেবে ব্ল্যাকমেল আদায় করছে, কিন্তু সে-টাকা তো সে হিসেবের খাতায় দেখাতে পারে না। এদিকে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে দিতে হয় মাসে পঁয়ত্রিশ

টাকা। প্রাণহারি খাতায় সাংকেতিক হিসেব লিখল, সত্তর টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা বাদ দিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা জমা করল। যাকে ব্ল্যাকমেল করছে তার নাম লিখতে পারে না, তাই ট্যাক্সি-ড্রাইভারের নাম লিখল। বুঝেছেন?’

বরাট বলিলেন, ‘বুঝেছি। অসম্ভব নয়। প্রাণহারির মনটা খুবই প্যাঁচালো ছিল, কিন্তু আপনার মন আরো প্যাঁচালো।’

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, ‘আচ্ছা, আজ উঠি। প্রাণহরি কাকে ব্ল্যাকমেল করছিল জানতে পারলে হয়তো খুনের একটা সূত্র পাওয়া যেত। কিন্তু ওর দলিল-পত্রে ওরকম কিছু বোধহয় পাওয়া যায়নি?

না। যে দু’চারটে কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাতে বে-আইনী কার্যকলাপের কোনো ইঙ্গিত নেই।–আজ ওবেলা আসছেন নাকি?’

লোমকেশ বলি, ওবেলা আপনাকে আর বিরক্ত করব না। ফণীশের সঙ্গে কয়লা ক্লাবে যাচ্ছি।

কয়লা ক্লাবের বাড়িটি সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড দ্বারা পারিবেষ্টিত। সামনে বাগান ও মোটর রাখিবার পার্কিং লন, দুই পাশে ব্যাডমিণ্টন টেনিস প্রভৃতি খেলিবার স্থান। বাড়িটি একতলা হইলেও অনেকগুলি বড় বড় ঘর আছে। মাঝখানের হলঘরে বিলিয়ার্ড খেলার

টেবিল; অন্য ঘরের কোনোটিতে পিংপং টেবিল, কোনোটিতে চার পাঁচটা তাস খেলার টেবিল ও চেয়ার। আবার একটা ঘরের মেঝোয় ফরাস পাতা, এখানে দাবা ও পাশা খেলার আসর। বাড়ির পিছন ভাগে দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর; একটিতে ম্যানেজারের অফিস, অন্যটিতে পানাহারের ব্যবস্থা, টুকিটাকি খাবার, নরম ও গরম নানা জাতীয় পানীয় এখানে সভ্যদের জন্য প্রস্তুত থাকে।

আমরা যখন ক্লাবে গিয়া পৌঁছিলাম তখনও যথেষ্ট দিনের আলো আছে। অনেক সভ্য সমবেত হইয়াছেন। বাহিরে টেনিস কোর্টে খেলা চলিতেছে; চারজন খেলিতেছে, বাকি সকলে কোর্টের পাশে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া খেলা দেখিতেছেন। ফণীশ আমাদের সেই দিকে লইয়া চলিল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া খেলা দেখিবার পর ব্যোমকেশ ফণীশের কানে কানে বলিল, 'তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ আছে নাকি?'

ফণীশ বলিল, 'ঐ যে খেলছেন, তোয়ালের নীল গেঞ্জি আর শাদা প্যান্টুলুন, উনি মৃগেন মৌলিক।'

একটু রোগা ধরনের শরীর হইলেও মৃগেন মৌলিকের চেহারা বেশ খেলোয়াড়ের মত। খেলার ভঙ্গীতে একটু চালিয়াতি ভাব আছে, কিন্তু সে ভালই টেনিস খেলে। ব্যাকহ্যান্ড বেশ জোরালো; নেটের খেলাও ভাল।

ব্যোমকেশ খেলা দেখিতে দেখিতে বলিল, 'বাকি দু'জন। এখানে নেই?'

ফণীশ বলিল, 'না। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

এই সময় পিছন হইতে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ব্যোমকেশবাবু-থুড়ি-গগনবাবু যে!'

ফিরিয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্ব-পরিচিত গোবিন্দ হালদার ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া মধুর গেরিলা-হাস্য হাসিতেছেন।

ব্যোমকেশ কিন্তু হাসিল না, স্থির-দৃষ্টিতে গোবিন্দবাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আসল নামটা জানতে পেরেছেন দেখছি। কি করে জানলেন?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'প্রথম দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর দুই আর দুয়ে মিলিয়ে দেখলাম ঠিক মিলে গেল। গগন-ব্যোমকেশ, সুজিত—অজিত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাদের নামকরণ ভাল হয়নি, কাঁচা কাজ হয়েছিল। কিন্তু আসল নামের বহুল প্রচার কি বাঞ্ছনীয়?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'আমি প্রচার করছি না। নামটা আলটপকা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। যা হোক, আমাদের ক্লাবে পদার্পণ করেছেন খুবই আনন্দের কথা। উদ্দেশ্য কিছু আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কি মনে হয়?'

গোবিন্দবাবুর মন্থর চক্ষু দু'টি একবার ফণীশের দিকে গিয়া আবার ব্যোমকেশের মুখে ফিরিয়া আসিল, 'আপনি কাজের লোক, অকারণে আমোদ করে বেড়াবেন বিশ্বাস হয় না। কাজেই এসেছেন। কিন্তু কোন কাজ? কয়লাখনির রহস্য উদঘাটন?

ব্যোমকেশ আবার বলিল, 'আপনার কি মনে হয়?'

গোবিন্দবাবুর চক্ষু দু'টি কুঞ্চিত হইয়া ক্রমে দুইটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হইল, 'তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছি। দেখুন, আপনি হুশিয়ার লোক, তবু সাবধান করে দিচ্ছি। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করবেন না।' তাঁহার কুঞ্চিত চক্ষুযুগল একবার ফণীশের দিকে সঞ্চারিত হইল, তারপর তিনি টেনিস কোর্টের কিনারায় গিয়া চেয়ারে বসিলেন।

ফণীশের মুখে শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছিল, সে স্বলিত স্বরে বলিল, 'গোবিন্দবাবু অরবিন্দবাবুর বড় ভাই। উনি যদি বাবাকে বলে দেন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভয় নেই, গোবিন্দবাবু কাউকে কিছু বলবেন না। উনি নিজের দুর্বত্ত ছোট ভাইটিকে ভালবাসেন।–চল, ভিতরে যাই।'

বাড়ির সামনের বারান্দায় একটি টেবিলে দৈনিক সংবাদপত্র সাপ্তাহিক প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে, আমরা সেইখানে গিয়া বসিলাম। ফণীশ একজন তকমাধারী ভৃত্যকে ডাকিয়া তিন গেলাস ঘোলের সরবৎ হুকুম করিল।

বরফ-শীতল সরবৎ চাখিতে চাখিতে দেখিতেছি, ঘোর ঘোর হইয়া আসিতেছে। বাহিরে টেনিস খেলা শেষ হইল। সভ্যেরা ভিতরে আসিতেছেন, নানা কথার ছিন্নাংশ কানে আসিতেছে। বাড়ির ভিতরে ঘরে ঘরে উজ্জ্বল বিদ্যুৎবাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। টেবিল-টেনিসের ঘর হইতে খটখট শব্দ আসিতেছে। হঠাৎ কোনও সভ্য উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতেছেন– এই বেয়ারা!

সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার একটি চলমান চিত্র।

সরবৎ নিঃশেষ হইলে আমরা সিগারেট ধরাইয়া বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। মাঝের হলঘরে দুইজন নিঃশব্দ খেলোয়াড় নিরুদ্বেগ মন্থরতায় বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন; প্রকাণ্ড টেবিলের উপর তিনটা বল তিনটি শিশুর মত লুকোচুরি খেলিতেছে। —এখানে আমাদের দ্রষ্টব্য কেহ নাই। এখান হইতে টেবিল-টেনিসের ঘরে গেলাম; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, হাফ-ভলির খেলা চলিতেছে; খাটাখাট শব্দে বল টেবিলের এপার হইতে ওপারে ছুটোছুটি করিতেছে; ব্যস্ত-সমস্ত একটি শুভ্র বুদ্বুদ। এ ঘরেও আমাদের দর্শনীয় কেহ নাই।

ফরাস-পাত ঘর হইতে মাঝে মাঝে হাল্লার আওয়াজ আসিতেছিল। সেখানে পাশা বসিয়াছে, চারজন খেলোয়াড় ছক ঘিরিয়া চতুষ্কোণভাবে বসিয়াছেন। একজন দুহাতে হাড় ঘষিতে ঘষিতে আদুরে সুরে পাশাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'পাশা! বারো-পাঞ্জা-সতেরো! একবারটি বারো-পাঞ্জা সতেরো দেখাও! এমন মার মারব, পেটের ছানা বেরিয়ে যাবে।' তিনি পাশা ফেলিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠিল—'তিনি কড়া! তিনি কড়া।'

আমরা দ্বারের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া তাসের ঘরে উপনীত হইলাম।

তাসের ঘরে সব টেবিল এখনও ভর্তি হয় নাই; কোনও টেবিলে একজন বসিয়া পেশেন্স খেলিতেছেন, কোনও টেবিলে তিনজন খেলোয়াড় চতুর্থ ব্যক্তির অভাবে গলা-কাটা খেলা খেলিয়া সময় কাটাইতেছেন। একটি টেবিলে চতুরঙ্গ খেলা বসিয়াছে; চারজন খেলোয়াড় গভীর মনঃসংযোগে নিজ নিজ তাস দেখিতেছেন। একজন বলিলেন, 'থ্রি হার্টস।' কন্ট্র্যাক্ট খেলা।

ফণীশ ফিসফিস করিয়া বলিল, 'যিনি ডাক দিলেন মধুময় সুর, আর তাঁর পার্টনার অরবিন্দ হালদার।'

ব্যোমকেশ টেবিলের কাছে গেল না, দূর হইতে সেইদিক পানে চাহিয়া রহিল। অরবিন্দ হালদার যে গোবিন্দ হালদারের ছোট ভাই, তাহা পরিচয় না দিলেও বোঝা যায়। সেই গেরিলাগঞ্জন রূপ, কেবল বয়স কম। মধুময় সুর ফিট্‌ফট শৌখিন লোক, চেহারায়

ব্যক্তিত্বের অভাব গিলে-করা পাঞ্জাবি ও হীরার বোতাম প্রভৃতি দিয়া পূর্ণ করিবার চেষ্টা দেখা যায়।

খেলা আরম্ভ হইয়াছে, ডামি হইয়াছেন বিপক্ষ দলের একজন। ফ্ল্যামের খেলা, কাহারও অন্য দিকে মন নাই।

পাঁচ মিনিট খেলা দেখিয়া ব্যোমকেশ ইশারা করিল, আমরা বাহিরে আসিলাম। সে সম্ভাব্য আসামীদের দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, শুষ্ক স্বরে বলিল, 'যা দেখবার দেখা হয়েছে, চল এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

মোটরে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী দেখলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনটে মানুষকে দেখলাম, তাদের পারিবেশ দেখলাম, হাত-পা নাড়া দেখলাম।–ফণীশ, কাল সকালে আমরা ওদের বাড়িতে যাব। আলাপ-পরিচয় করা দরকার। আজ যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশি কিছু পাব আশা করি না, তবু—'

'আজ কিছু পেয়েছ তাহলে?'

'পেয়েছি। যদিও সেটা নেতিবাচক।'

পরদিন সকালে ফণীশ বাপের সঙ্গে কয়লাখনিতে গেল না, মণীশবাবু একাই গেলেন। ফণীশ আমাদের গাড়ি চালাইয়া লইয়া চলিল। গাড়িতে স্টার্ট দিয়া বলিল, 'আগে কোথায় যাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার কারুর প্রতি পক্ষপাত নেই, যার বাড়ি কাছে তার বাড়িতে আগে চল।'

'তাহলে মৃগেনবাবুর বাড়িতে চলুন।'

মৃগেন মৌলিকের বাড়িটি অতিশয় সুশ্রী, গৃহস্বামীর শৌখিন রুচির পরিচয় দিতেছে। আমাদের মোটর বাগান পার হইয়া গাড়ি-বারান্দায় উপস্থিত হইলে দেখিলাম মৃগেন মৌলিক বাড়ির সম্মুখে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে, তাহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও সিল্কের ড্রেসিং গাউন। আমরা গাড়ি হইতে নামিলে সে কাগজ মুড়িয়া আমাদের পানে চোখ তুলিল। স্বাগত সম্ভাষণের হাসি তাহার মুখে ফুটিল না, বরঞ্চ মুখ অন্ধকার হইল। আমরা তাহার নিকটবর্তী হইলে সে রূঢ় স্বরে বলিল, 'কি চাই?'

আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ফণীশ বলিল, 'মৃগেনবাবু, এঁরা আমার বাবার বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছেন–'

ফণীশের প্রতি তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃগেন বলিল, 'জানি। ব্যোমকেশ বক্সী কার নাম?'

ফণীশ থাতমত খাইয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি ব্যোমকেশ বক্সী। আপনার সঙ্গে দুটো কথা ছিল।'

মৃগেন মুখ বিকৃত করিয়া অসীম অবজ্ঞার স্বরে বলিল, 'এখানে কিছু হবে না, আপনারা যেতে পারেন।' বলিয়া নিজেই কাগজখানা বগলে লইয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। ফণীশের মুখ অপমানে সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিয়াছে , ব্যোমকেশের অধরে লাঞ্ছিত হাসি। সে বলিল, 'গোবিন্দ হালদার দেখছি আসামীদের সতর্ক করে দিয়েছেন।'

ফণীশ বলিল, চলুন, বাড়ি ফিরে যাই।' ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, যখন বেরিয়েছি তখন কাজ সেরে বাড়ি ফিরব। ফণীশ, তুমি লজ্জা পেও না। সত্যান্বেষণ যাদের কাজ তাদের লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করতে হয়; চল, এবার মধুময় সুরের বাড়িতে।'

মোটরে যাইতে যাইতে আমি বলিলাম, কিন্তু কেন? এরকম ব্যবহারের মানে কি? মৃগেন মৌলিক যদি নির্দোষ হয় তাহলে তার ভয় কিসের?'

ব্যোমকেশ বলিল, ‘ওদের ধারণা হয়েছে। আমি ফণীশের দলের লোক, ফণীশকে বাঁচিয়ে ওদের ফাঁসিয়ে দিতে চাই।’

মধুময় সুরের বাড়িটি সেকেলে ধরনের, বাগানের কোনও শোভা নাই। বাড়ির সদর বারান্দায় মধুময় সুর গামছা পরিয়া মাদুরের উপর শুইয়া ছিল এবং একটা মুস্কো জোয়ান চাকর তৈল দিয়া তাহার দেহ ডলাই-মলাই করিতেছিল। মধুময়ের শরীর খুব মাংসল নয় , কিন্তু একটি নিরেট গোছের ক্ষুদ্র ভূড়ি আছে! আমাদের দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল।

ফণীশ ক্ষীণ কুণ্ঠিত স্বরে আরম্ভ করিল, ‘মধুময়বাবু, মাফ করবেন, এটা আপনার স্নানের সময়—’

মধুময় তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদের দিকে কয়েকবার চক্ষু মিটমিটি করিল , তারপর পাখি-পড়া সুরে বলিল, ‘আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন, আমি প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানি না। যদি কেউ বলে থাকে আমি তার মৃত্যুর রাত্রে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তবে তা মিথ্যে কথা। অন্য কেউ গিয়েছিল। কিনা আমি জানি না, আমি যাইনি।’ বলিয়া মধুময় সুর আবার শয়নের উপক্রম করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, ট্যাক্সি-ড্রাইভার কিন্তু আপনাকে সনাক্ত করেছে।’

মধুময় বলিল, ট্যাক্সি-ড্রাইভার মিথ্যাবাদী। —আসুন, নমস্কার।’

ব্যোমকেশ চন্টু করিয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনার একটা টর্চ আছে?'

মধুময় বলিল, 'আমার পাঁচটা টার্চ আছে। আসুন, নমস্কার।'

মধুময় শয়ন করিল, ভৃত্য আবার তেল-মর্দন আরম্ভ করিল। আমরা চলিয়া আসিলাম।

অরবিন্দ হালদারের বাড়ির দিকে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা আসব মধুময় জানতো, আমাদের কী বলবে মুখস্থ করে রেখেছিল। যাই বল, মৃগেন মৌলিকের চেয়ে মধুময় সুর ভদ্র। কেমন মিষ্টি সুরে বলল-আসুন, নমস্কার। নিমচাঁদ দত্তের ভাষায়-ছেলেটি বে-তরিবৎ নয়।'

অরবিন্দ হালদার ও গোবিন্দ হালদার একই বাড়িতে বাস করেন, কিন্তু মহল আলাদা। অরবিন্দ নিজের বৈঠকখানায় ফরাস-ঢাকা তক্তপোশের উপর মোটা তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া সিগারেট টানিতেছিল, আমাদের দেখিয়া কনুই-এ ভর দিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, কালো মুখে অক্ষৌরিত দাড়ির কর্কশতা। সে আমাদের পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, 'এস ফণীশ।'

ফণীশ পাংশুমুখে বলিল, 'এঁরা—'

অরবিন্দ বলিল, 'জানি। বসুন আপনারা।' বলিয়া সিগারেটের কোটা আগাইয়া দিল।

শিষ্টতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তাই একটু খতমীত হইলাম। ব্যোমকেশ তক্তপোশের কিনারায় বসিল, আমরাও বসিলাম। অরবিন্দ সহজ সুরে বলিল, 'কাল রাত্রে মাত্রা বেশি হয়ে গিয়েছিল। এখনো খোঁয়ারি ভাঙেনি।–ওরে গদাধর।'

একটি ভৃত্য কাচের গেলাসে পানীয় আনিয়া দিল, অরবিন্দ এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিয়া গেলাস ফেরৎ দিয়া বলিল, 'আপনাদের জন্যে কী আনাব বলুন। চা? সরবৎ? বীয়ার?

ব্যোমকেশ বিনীত কণ্ঠে বলিল, 'ধন্যবাদ। ওসব কিছু চাই না, অরবিন্দবাবু; আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলবার সুযোগ পেলেই কৃতার্থ হয়ে যাব।'

অরবিন্দ বলিল, 'বিলক্ষণ! কি বলকেন বলুন। তবে একটা কথা গোড়ায় জানিয়ে রাখি। সুন্টু স্থাপনাকে কী বলেছে জানি না, কিন্তু প্রশস্ত্রর পোস্কারের মৃত্যুর রাত্রে আমি তার বাড়িতে যাইনি।'

ব্যোমকেশ একটু নীরব থাকিয়া বলিল, 'অরবিন্দবাবু, আমার কোনো কু-মতলব নেই। নির্দোষ বুক্সমুলা মামলায় ফাঁসালে আমার কাজ নয়, আমি সত্যান্বেষী। অবশ্য আপনি যদি অপরাধী হন–'

অরবিন্দ বলিল, 'আমি নিরপরাধ। প্রাণহোরর মৃত্যুর রাত্রে আমি তার বাড়ির ত্রিসীমানায় যাইনি। এই কথাটা বুঝে নিয়ে যা প্রশ্ন করবেন করুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, ও প্রসঙ্গ না হয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু প্রাণহারির মৃত্যুর আগে আপনি কয়েকবার তার বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

অরবিন্দ বলিল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। আমরা চারজনে জুয়া খেলতে যেতাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'জুয়া খেলার সময় ছাড়াও আপনি কয়েকবার একলা তার বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

অরবিন্দের মুখে একটা বিশ্রী লুচ্চামির হাসি খেলিয়া গেল, সে বলিল, 'তা গিয়েছিলাম।'

'কি জন্যে গিয়েছিলেন?'

নির্লজভাবে দন্ত বিকাশ করিয়া অরবিন্দ বলিল, 'মোহিনীকে দেখতে। তার সঙ্গে ভাব জমাতে।'

ব্যোমকেশ বাঁকা সুরে বলিল, 'কিন্তু সুবিধে হল না?'

অরবিন্দের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে বড় বড় চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, 'সুবিধে হল না—তার মানে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মানে বুঝতেই পারছেন। আপনি কি বলতে চান যে-?'

অরবিন্দ হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর হাসি থামাইয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি মস্ত একজন ডিটেকটিভ হতে পারেন। কিন্তু দুনিয়াদারির কিছুই জানেন না। মোহিনী তো তুচ্ছ মেয়েমানুষ, দাসীবাদী। টাকা ফেললে এমন জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কত টাকা ফেলেছিলেন?'

অরবিন্দ দুই আঙুল তুলিয়া বলিল, 'দু'হাজার টাকা।'

'মোহিনীকে দু'হাজার টাকা দিয়েছিলেন? দাসীবাদীর পক্ষে দাম একটু বেশি নয় কি?'

'মোহিনীকে দিইনি। মোহিনীর দালালকে দিয়েছিলাম। প্রাণহরি পোদ্দারকে।' অরবিন্দের কথাগুলো বিষমাখানে।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা, ও কথা যাক। প্রাণহরি পোদ্দার লোকটা কেমন ছিল?'

অরবিন্দ নীরসকণ্ঠে বলিল, 'চামার ছিল, অর্থ-পিশাচ ছিল। সাধারণ মানুষ যেমন হয় তেমনি ছিল।'

সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে অরবিন্দের ধারণা খুব উচ্চ নয়। ব্যোমকেশ বলিল, 'জুয়াতে প্রাণহারি পোদ্দার আপনাদের অনেক টাকা ঠকিয়েছিল?'

অরবিন্দ তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'সে জিতেছিল আমরা হেরেছিলাম। ঠকিয়েছিল কিনা বলতে পারি না।'

'তবে তাকে ঠেঙাতে গিয়েছিলেন কেন?'

অরবিন্দ উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়া থামিয়া গেল, ব্যোমকেশকে একবার ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কে বললে ঠেঙাতে গিয়েছিলাম? যারা গিয়েছিল তারা নিজের কথা বলুক, আমি কাউকে ঠেঙাতে যাইনি।'

আমি ফণীশের দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সে হেঁট মুখে শুনিতেছিল, একবার চোখ তুলিয়া অরবিন্দের পানে চাহিল, তারপর আবার মাথা হেঁট করিল।

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে বলিল, 'আপনি যেটুকু বললেন, তাতেও গরমিল আছে, মোহিনীর কথার সঙ্গে আপনার কথা মিলছে না। হয়তো আপনার কথাই সত্যি। আচ্ছা, নমস্কার। আপনার দাদাকে বলবেন, পুলিসকে ঘুষ দিতে যাওয়া নিরাপদ নয়, তাতে সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। সব পুলিস অফিসার ঘুষখোর নয়।'

০৪. প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যুরহস্য

অতঃপর তিনদিন আমরা প্রায় নিষ্কর্মার মত কাটাইয়া দিলাম, প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যুরহস্য ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলিয়া রহিল। নূতন তথ্য আর কিছু পাওয়া যায় নাই, পূর্বে সামান্য যেটুকু পাওয়া গিয়াছিল তাঁহাই সম্বল। কটক হইতে ইন্সপেক্টর বরাটের বন্ধু পট্টনায়ক প্রাণহারির অতীত সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার দ্বারাও খুনের উপর আলোকপাত হয় নাই। প্রাণহরি পোদ্দার পেশাদার জুয়াড়ী ছিল, কিন্তু কোনও দিন পুলিসের হাতে পড়ে নাই। সে বছর-দুই কটকে ছিল, কোথা হইতে কটকে আসিয়াছিল তাহা জানা যায় না। তাহার পোষ্য কেহ ছিল না, কাজকর্মও ছিল না। নিজের বাড়িতে কয়েকজন বড়মানুষের অবচীিন পুত্রকে লইয়া জুয়ার আডডা বসাইত। ক্রমে অবচীিনেরা বুঝিল প্রাণহোর জুয়াচুরি করিয়া তাঁহাদের রুধির শোষণ করিতেছে, তখন তাহারা প্রাণহারিকে উত্তম-মধ্যম দিবার পরামর্শ করিল। কিন্তু পরামর্শ কর্যে পরিণত করিবার পূর্বেই একদিন প্রাণহরি পোদ্দার নিরুদ্দেশ্য হইল। তাহার বাড়িতে একটি যুবতী দাসী কাজ করিত, সেও লোপাট হইল। অনুমান হয় বৃদ্ধ প্রাণহারির সহিত দাসীটার অবৈধ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

পট্টনায়কের চিঠি হইতে শুধু এইটুকুই পরিস্ফুট হয় যে প্রশক্তি কর্মজীবনে একটা বিশিষ্ট প্যাটার্ণ ছিল।

বোমকেশের চিত্তে সুখ নাই। ইন্দিরার চোখে অবার উদ্বেগ ও আশঙ্কা ঘনীভূত হইতেছে। ফণীশ ছট্‌ফট করিতেছে। মণীশবাবু গভীর প্রকৃতির লোক, কিন্তু তিনিও যেন একটু অধীর হইয়া উঠিতেছেন। কয়লাখনির অনামা দুর্বত্তেরা এখনও ধরা পড়ে নাই।

এই তিন দিনের মধ্যে কেবল একটিমাত্র বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার উল্লেখ করা যায়। বিকাশ দত্ত আসিয়াছে এবং কয়লাখনির হাসপাতালে যোগ দিয়াছে। আমরা একদিন বিকাশের সঙ্গে দেখা করিয়াছে এবং উপদেশ দিয়া আসিয়াছে।

এই তিন দিনের মধ্যে কেবল একটিমাত্র বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার উল্লেখ করা যায়। ব্যোমকেশ ক্রমান্বয়ে বিছানায় শুইয়া, ঘরে পায়চারি করিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কাল সন্ধ্যার পর আমাকে বলিল, ‘চল, রাস্তায় একটু বেড়ানো যাক।’

রাস্তাটা নির্জন, আলো খুব উজ্জ্বল নয়, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে দু’ একজন পদচারী, দুই একটি মোটর যাতায়াত করিতেছে। ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, ‘প্রাণহরি পোদ্দারের মত একটা থার্ড ক্লাস লোকের হত্যারহস্য তদন্ত করার কী দরকার? যে মেরেছে বেশ করেছে, তাকে সোনার মেডেল দেওয়া উচিত।’

বলিলাম, ‘সোনার মেডেল দিতে হলেও তো লোকটাকে চেনা দরকার।’

আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, মোহিনীর কাছে আর একবার যেতে হবে। তাকে একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি।’

এই সময় বাইসাইকেল প্রথম লক্ষ্য করিলাম। আমরা রাস্তার একটু পাশ ঘেঁষিয়া পায়চারি করিতেছিলাম, দেখিলাম সামনের দিকে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সাইকেল আসিতেছে। সাইকেলে আলো নাই, রাস্তার আলোতে আরোহীকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়; তাহার মাথায় সোলার টুপি মুখখানাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সাইকেল আমাদের কাছে আসিয়া পড়িল, তারপর আরোহী আমাদের পায়ের কাছে একটা সাদাগোছের বস্তু ফেলিয়া দিয়া দ্রুত পেডাল ঘুরাইয়া অদৃশ্য হইল।

ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। দশ হাত দূরে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টি শ্বেতাভ বস্তুটার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু কিছু ঘটিল না, টেনিস বলের মত বস্তুটা জড়বৎ পড়িয়া রহিল। উহা যে বোমা হইতে পারে একথা আমার মাথায় আসে নাই; তখন ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার বুক ঢিবঢিব করিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, চাটু করে বাড়ি থেকে একটা টর্চ নিয়ে এস তো।'

সে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি পিছু হটিয়া বাড়িতে গেলাম। ফণীশ ও মণীশবাবু দু'জনেই খবর শুনিয়া আমার সঙ্গে আসিলেন।

'কি ব্যাপার?' ব্যো

মকেশ বলিল, 'কাছে আসবেন না। হয়তো কিছুই নয়, তবু সাবধান হওয়া ভাল। অজিত, টর্চ আমাকে দাও।'

টর্চ লইয়া সে ভূ-পতিত বস্তুটার উপর আলো ফেলিল। আমি গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, কাগজের একটা মোড়ক ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছে। ব্যোমকেশ কাছে গিয়া আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া বস্তুটা তুলিয়া লইল। হাসিয়া বলিল, 'কাগজে মোড়া এক টুকরো পাথুরে কয়লা।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'কয়লা–!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কয়লা মুখ্য নয়, কাগজটাই আসল। চলুন, বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক।'

ড্রয়িং-রুমে উজ্জ্বল আলোর নীচে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ সন্তর্পণে মোড়ক খুলিল। পাথুরে কয়লার টুকরো টেবিলে রাখিয়া কুঞ্চিত কাগজটির দুই পোশ ধরিয়া আলোর দিকে তুলিয়া ধরিল। কাগজটা আকারে সাধারণ চিঠির কাগজের মত, তাহাতে কালি দিয়া বড় বড় অক্ষরে দু'ছত্র লেখা—'ব্যোমকেশ বক্সী, যদি অবিলম্বে শহর ছাড়িয়া না যাও তোমাকে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না।'

'কী ভয়ানক, আপনার নাম জানতে পেরেছে।' মণীশবাবু হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'দেখি কাগজখানা।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, আপনার ছুঁয়ে কাজ নেই। কাগজে হয়তো আঙুলের ছাপ আছে।'

কাগজখানি সাবধানে ধরিয়া ব্যোমকেশ শয়নকক্ষে আসিল। আমিও সঙ্গে আসিলাম। টেবিলের উপর একটি সচিত্র বিলাতি মাসিকপত্র ছিল, তাহার পাতা খুলিয়া সে কাগজখানি সযত্নে তাহার মধ্যে রাখিয়া দিল। আমি বলিলাম, 'কোন পক্ষের চিঠি। অবশ্য কয়লা দেখে মনে হয়। কয়লাখনির আসামীরা জানতে পেরেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা ধাপ্পা হতে পারে। গোবিন্দ হালদার জানেন আমি কয়লাখনি সম্পর্কে এখানে এসেছি।'

ড্রয়িং-রুমে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম অফিসের বড়বাবু সুরপতি ঘটক আসিয়াছেন, কর্তার সঙ্গে বোধকরি অফিসঘটিত কোনও পরামর্শ করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া সবিনয়ে নমস্কার করিলেন।

তিনি বাক্যালাপ করিয়া প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ মণীশবাবুকে বলিল, 'আপনি সুরপতিবাবুকে কিছু বলেননি তো?'

মণীশবাবু বলিলেন, 'না।–পাঁজি ব্যাটারা কিন্তু ভয় পেয়েছে।'

ব্যোমাকেশ বলিল, 'ভয় না পেলে আমাকে ভয় দেখাতো না।'

মণীশবাবু খুশি হইয়া বলিলেন, 'আপনি তলে তলে কি করছেন আমি জানি না। কিন্তু নিশ্চয় কিছু করছেন, যাতে পাজি ব্যাটারা ঘাবড়ে গেছে। —যাহোক, চিঠি পেয়ে আপনি ভয় পাননি তো?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ভয় বেশি পাইনি। তবু আজ রাত্তিরে দোর বন্ধ করে শোব।'

সকালবেল ফণীশ আমাদের থানায় নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আমাকে একবার বাজারে যেতে হবে, ইন্দিরার একটা জিনিস চাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। অসুবিধা হবে না তো?

'না। আমরা এখানে ঘণ্টাখানেক আছি।'

ফণীশ মোটর লইয়া চলিয়া গেল, আমরা থানায় প্রবেশ করিলাম।

প্রমোদবাবু টেবিলের সামনে বসিয়া কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, ব্যোমকেশ সচিত্র বিলাতি মাসিকপত্রটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, 'এর মধ্যে এক টুকরো কাগজ আছে, তাতে আঙুলের ছাপ থাকতে পারে। আপনার finger-print expert আছে?

পত্রিকার পাতা তুলিয়া দেখিয়া বরাট বলিলেন, 'আছে বৈকি। কি ব্যাপার?'

ব্যোমকেশ গত রাত্রির ঘটনা বলিল। শুনিয়া বরাট বলিলেন, 'কিয়লাখনির ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। এখনি ব্যবস্থা করছি। আজ বিকেলবেলাই রিপোর্ট পাবেন।'

তিনি লোক ডাকিয়া পত্রিকাসমেত কাগজখানা করাঙ্ক বিশেষজ্ঞগণের কাছে পঠাইয়া দিলেন, তারপর বলিলেন, 'তিনদিন আপনি আসেননি, ওদিকের খবর কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যথা পূর্বং তথা পরং, নতুন কোনো খবর নেই। কিন্তু একটা খট্‌কা লাগছে?'

'কিসের খট্‌কা?'

'মোহিনীকে প্রাণহরি পনেরো টাকা মাইন দিত। হিসেবের খাতা কিন্তু মোহিনীর মাইনের উল্লেখ নেই।'

বরাট চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'হুঁ। প্রাণহারির হিসেবের খাতায় দেখছি বিস্তর গলদ। এখন কি করবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহিনীকে প্রশ্ন করে দেখতাম। সে এখনো আছে তো?'

বরাট বলিলেন, 'দিব্যি আছে, নড়বার নামটি নেই। আমিও ছাড়তে পারছি না, যতক্ষণ না এ মামলার একটা হেস্তনেস্ত হয়–'

'তাহলে আমরা একবার ঘুরে আসি।'

চলুন।'

না না, আপনার অন্য কাজ রয়েছে, আপনি থাকুন। আমি আর অজিত যাচ্ছি। আপনার সেই তরুণ কনস্টেবলটিকে সেখানে পাব তো?'

বরাট হাসিলেন, 'আলবৎ পাবেন।'

থানা হইতে বাহির হইলাম। ফণীশের এখনও ফিরিবার সময় হয় নাই, আমরা ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে চলিলাম।

থানার অনতিদূরে রাস্তার ধারে একটি বিপুল পাকুড় গাছের ছায়ায় ট্যাক্সি দাঁড়াইবার স্থান। সেইদিকে যাইতে যাইতে আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, প্রাণহারির সঙ্গে কয়লাখনির ব্যাপারের কি কোনো সম্বন্ধ আছে?

সে বলিল, 'কিছু না। একমাত্র আমি হচ্ছি যোগসূত্র।'

ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের কাছাকাছি গিয়া দেখিলাম। গাছতলায় মাত্র একটি ট্যাক্সি আছে এবং রাস্তার ধার ঘোষিয়া একটা প্রকাণ্ড কালো–রঙের মোটর আমাদের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভুবন দাস কালো মোটরের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া চালকের সহিত কথা বলিতেছে। আমরা আর একটু নিকটবর্তী হইতেই কালো মোটরটা চলিয়া গেল। ভুবন দাস নিজের ট্যাক্সির কাছে ফিরিয়া চলিল।

ব্যোমকেশ গভীর ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, 'কার মোটর চিনতে পারলে? গোবিন্দ হালদারের মোটর। প্রথমদিন নম্বরটা দেখেছিলাম।'

'গোবিন্দ হালদার ট্যাক্সিওয়ালার কাছে কী চায়?'

'বোধ হয় সাক্ষী ভাঙাতে চায়। এস দেখি।'

আমরা যখন ট্যাক্সির কাছে পৌঁছিলাম তখন ভুবন গাড়ির বুট্ হইতে জ্যাক বাহির করিয়া চাকার নীচে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া স্যালুট করিল, বলিল, ট্যাক্সি চাই স্যার?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, একবার প্রাণহারিবাবুর বাড়িতে যেতে হবে। সেখানে একজন মেয়েলোক থাকে তার সঙ্গে দরকার আছে।'

ভুবন আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, মাথা চুলকাইয়া বলিল, ‘আমার তো একটু দেরি হবে স্যার। টায়ার পাঞ্চার হয়েছে, চাকাটা বদলাতে হবে।’

ব্যোমকেশ অতর্কিতে প্রশ্ন করিল, ‘গোবিন্দ হালদার তোমার সঙ্গে কী কথা বলছিলেন?’

ভুবন চমকিয়া উঠিল, ‘আজ্ঞে?—উনি—উনি আমাকে চেনেন, তাই দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলছিলেন। ভারি ভাল লোক।’ বলিয়া জ্যাকের যন্ত্র প্রবলবেগে ঘুরাইয়া গাড়ির চাকা শূন্যে তুলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া দেখি সে তন্দ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চক্ষু, ভুবনের উপর নিবদ্ধ কিন্তু সে মনশ্চক্ষে অন্য কিছু দেখিতেছে। আমি ডাকিলাম, ‘ব্যোমকেশ।’

সে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বিড়বিড় করিয়া বলিল, ‘অজিত, পনরোর সঙ্গে পয়ত্রিশ যোগ দিলে কত হয়।

বলিলাম, ‘পঞ্চাশ। কী আবোল-তাবোল বকছ?’

সে বলিল, ‘এস।’ বলিয়া থানার দিকে ফিরিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া আমি ফিরিয়া চাহিলাম, ভুবন একাগ্র দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকাইয়া আছে।

থানায় উপস্থিত হইলে বরাট মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এ কি, গেলেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমোদবাবু, আপনার থানায় কোনও নিরিবিলি জায়গা আছে? আমি নির্জনে বসে একটু ভাবতে চাই।'

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। বরাট তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

থানার পিছন দিকে একটি ঢাকা বারান্দা, লোকজন নেই, কয়েকটা চেয়ার পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ একটি ইজি-চেয়ারে লম্বা হইয়া সিগারেট ধরাইল। বরাট মৃদু হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

আধা ঘণ্টার মধ্যে গোটা পাঁচেক সিগারেট নিঃশেষ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, হয়েছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, কী হয়েছে?'

সে বলিল, 'দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, সত্যদর্শন হয়েছে। এস।'

বরাটের ঘরে গিয়া তাঁহার টেবিলের পাশে দাঁড়াইতেই তিনি উৎসুক মুখ তুলিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রমোদবাবু, কোন ব্যাঙ্কে প্রাণহরির টাকা আছে?'

বরাট বলিলেন, 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে। কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সেখানে সেফ-ডিপজিট ভল্ট আছে কিনা জানেন?ট

'আছে বোধ হয়।'

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এতক্ষণ ব্যাঙ্ক খুলেছে। —চলুন।'

বরাট আর প্রশ্ন না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ফণীশ ফিরিয়াছে এবং গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'নেমো না, আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিতে হবে।'

শহরের মাঝখানে ব্যাঙ্কের বাড়ি, দ্বারে বন্দুকধারী শান্ত্রীর পাহারা। গাড়ি হইতে নামিবার পূর্বে ব্যোমকেশ ফণীশকে বলিল, 'ফণীশ, তুমি বাড়ি যাও, আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে।–ভালো কথা, বৌমার বাপের বাড়ি কোথায়?'

ফণীশ সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'নবদ্বীপে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। তাহলে নিশ্চয় মালপো তৈরি করতে জানেন। তাঁকে বলে দিও আজ বিকেলে আমরা মালপো খাব।'

আমরা নামিয়া গেলাম, ফণীশ একটু নিরাশভাবে গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। সে বুঝিয়াছিল , প্রাণহোরর মৃত্যুরহস্য সমাধানের উপান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বিরাট আমাদের ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ঘরে লইয়া গেলেন; ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁহার আগে হইতেই আলাপ ছিল। বলিলেন, 'প্রাণহরি পোদ্দারের ব্যাপারে এসেছি। আপনার ব্যাঙ্কে সেফ-ডিপজিট ভল্ট আছে?

ম্যানেজার বলিলেন, 'আছে।'

বরাট ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রাণহরি পোদ্দার ভল্ট ভাড়া নিয়েছিলেন নাকি?'

ম্যানেজার একজন কর্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল, 'হ্যাঁ, নিয়েছিলেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তার সেফ-ডিপজিট কী আছে আমরা দেখতে চাই।'

ম্যানেজার কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, 'কিন্তু ব্যাঙ্কের নিয়ম নেই। অবশ্য যদি পরোয়ানা থাকে—'

বরাট বলিলেন, 'প্রাণহরি পোদ্দারকে খুন করা হয়েছে। তার সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র অনুসন্ধান করবার পরোয়ানা পুলিসের আছে।'

ম্যানেজার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'বেশ। চাবি এনেছেন?'

'চাবি?'

'সেফ-ডিপজিটের প্রত্যেকটি বাক্সের দুটো চাবি; একটা থাকে যিনি ভাড়া নিয়েছেন তাঁর কাছে, অন্যটা থাকে ব্যাঙ্কের জিম্মায়। দুটো চাবি না পেলে বাক্স খোলা যায় না।'

ব্যোমকেশ বরাটের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল। বিরাট বলিলেন, 'ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয় আছে?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের ডিরেকটারদের হুকুম না পেলে আপনাদের দিতে পারি না। হুকুম পেতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগবে।'

ব্যোমকেশ বরাটকে বলিল, 'চলুন, আর একবার প্রাণহোরর সিন্দুক খুঁজে দেখা যাক। নিশ্চয় ওই ঘরেই কোথাও আছে।'

বরাট উঠিলেন, ম্যানেজারকে বলিলেন, 'আমরা আবার আসছি। যদি চাবি খুঁজে না পাই, দরখাস্ত করব।'

আমরা থানায় ফিরিয়া গেলাম, সেখান হইতে আরও দুইজন লোক লইয়া পুলিস-কারে প্রাণহারির বাড়িতে উপনীত হইলাম।

আজ তরুণ কনস্টেবলটি বাড়ির সামনে টুল পাতিয়া বসিয়া ছিল, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে স্যালুট করিল।

দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ বরাটকে বলিল, 'আমি মোহিনীকে দু-একটা প্রশ্ন করি , ততক্ষণ আপনারা ওপরের ঘর তল্লাশ করুন গিয়ে। আমার বিশ্বাস চাবি খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। হয়তো সিন্দুকেই আছে, আপনারা লুকোনো জিনিস খোঁজেননি, তাই পাননি। তখন তো আপনারা জানতেন না যে প্রাণহারির সেফ-ডিপজিট আছে।'

পুলিসের দল সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ব্যোমকেশ ও আমি রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

মোহিনী দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া রান্না করিতেছিল, আমাদের পদশব্দে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। আমাদের দেখিয়া চকিত ত্রাসে তাহার চক্ষু একবার বিস্ফারিত হইল, তারপর সে উনান হইতে কড়া নামাইয়া আচলে হাত মুছিতে মুছিতে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'কিছু দরকার আছে বাবু? তাহার ক্ষণিক ত্রাস কাটিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি এখনো আছ দেখছি। দেশে ফিরে যাচ্ছ না কেন?'

মোহিনী বলিল, 'কি করব বাবু, পুলিস ছেড়ে না দিলে যাই কি করে?

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার বাপ-মাকে কিংবা স্বামীকে খবর দিয়েছ?'

মোহিনী ক্ষণকাল চক্ষু নত করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'স্বামী কোথায় জানি না। বাপ-মাকে খবর দিইনি। তারা বুড়ো মানুষ, কি হবে তাদের খবর দিয়ে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। আচ্ছা, একটা কথা বল দেখি, যে-রাত্রে প্রাণহারিবাবু খুন হয়েছিলেন, সে-রাত্রে তিনি যখন খেতে নামলেন না, তখন তুমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলে?'

মোহিনী সায় দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ বাবু।'

'ঘরে আলো জ্বলছিল?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'ঘরের পিছন দিকের দরজা, অর্থাৎ স্নানের ঘরের দরজা খোলা দেখেছিলে?'

'না বাবু।' মোহিনীর চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

'দরজা বন্ধ ছিল?'

পলকের জন্য মোহিনী দ্বিধা করিল, তারপর বলিল, 'আমি কিছুই দেখিনি বাবু। কর্তাবাবু মরে পড়ে আছেন দেখে ছুটে পালিয়ে এসেছিলুম।'

'তুমি স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করে দাওনি?'

'আজ্ঞে না।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, 'প্রাণহারবাবু তোমাকে পনেরো টাকা মাইনে দিতেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'প্রতি মাসে ঠিক সময়ে মাইনে দিতেন?'

মানুষ যখন মনে মনে এক কথা ভাবে এবং মুখে অন্য কথা বলে তখন তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা যায়, তেমনি অন্যমনস্কভাবে মোহিনী বলিল, 'আমার মাইনে কর্তাবাবুর কাছে জমা থাকত, দরকার হলে দুএক টাকা চেয়ে নিতুম।'

ব্যোমকেশের পানে কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলাম সে মৃদু হাসিতেছে। সে বলিল, 'তোমার মাইনের টাকা বোধহয় মারা গেল। আচ্ছা, এবার আমার শেষ প্রশ্ন : তুমি কোনো ন্যাটা লোককে চোন?'

মোহিনী অবাক হইয়া বলিল, 'ন্যাটা লোক! সে কাকে বলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ন্যাটা জান না? যে ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাত বেশি চালায় তাকে ন্যাটা বলে।'

মোহিনী সহসা বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল, 'না। বাবু, সে রকম কাউকে আমি চিনি না।'

মোহিনী দাঁড়াইয়া রহিল, আমরা উপরে প্রাণহারির শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলাম।

চাবি পাওয়া গিয়াছে। বেশি খোঁজাখুঁজি করিতে হয় নাই; সিন্দুক ও দেয়ালের মাঝখানে যে স্বল্প-পরিসর স্থান ছিল সেই স্থানে সিন্দুকের পিঠে চাবিটা মোম দিয়া আটকানো ছিল। বরাট বলিল, 'এই নিন।'

নম্বর খোদাই করা লম্বা একটি চাবি। ব্যোমকেশ তাহা পরিদর্শন করিয়া বলিল, 'চলুন আবার ব্যাংকে।'

ব্যাঙ্কে গিয়া ম্যানেজারের নিকট চাবি পেশ করা হইল। তিনি এবার আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, স্বয়ং উঠিয়া আমাদের ভল্টে লইয়া গেলেন। ব্যাঙ্কের বাড়ির নীচে মাটির তলায় ঘর, তাহার তিনটি দেয়াল জুড়িয়া কাতারে কাতারে দ্বারযুক্ত স্টীলের খোপ শোভা পাইতেছে।

দুইটি চাবি মিলাইয়া প্রাণহারির খোপের কবাট খোলা হইল। খোপের মধ্যে টাকাকড়ি, গয়নাগটি কিছু নাই, কেবল কয়েকটি পুরাতন চিঠি এবং এক বাণ্ডিল বন্ধকী তমসুক।

চিঠিগুলি প্রাণহরিকে লেখা নয়, প্রাণহারির দ্বারাও লিখিত নয়। অজ্ঞাতনামা পুরুষ বা নারীর দ্বারা অজ্ঞাতনামা লোকের নামে লেখা। সম্ভবত এই পত্রগুলিকে অস্ত্র করিয়া প্রাণহরি লেখক ও লেখিকাদের রুধির শোষণ করিতেন।

চিঠিগুলিতে ব্যোমকেশের প্রয়োজন ছিল না, সে তমসুকগুলি লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া সে একে একে তমসুকগুলিতে চোখ বুলাইল। তারপর একটি তমসুক তুলিয়া ধরিয়া বরাটকে বলিল, 'এই নিন। আপনার আসামী।'

তমসুকে আইনসঙ্গত ভাষায় লেখা ছিল, মহাজন প্রাণহরি পোদ্দার ভগবানপুর নিবাসী ভুবনেশ্বর দাসকে ক্রেতব্য মাটরগাড়ি বন্ধক রাখিয়া আড়াই হাজার টাকা কর্জ দিয়াছেন। কীভাবে ভুবনেশ্বর দাস এই ঋণ শোধ করিবে তাহার শর্তও দলিলে লেখা আছে : পঞ্চাশ

টাকা নগদ; প্রাণহরি মোটর ব্যবহার করিবেন তাহার মাসিক ভাড়া পাঁচশ টাকা; একুনে পঁচাত্তর টাকা হিসাবে মাসে শোধ হইবে।

বরাট ভ্রূ তুলিয়া বোমকেশের পানে চাহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, ‘আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার যা করবার আপনি করবেন।’

বরাট বলিলেন, ‘কিন্তু খুনের প্রমাণ?’

‘প্রমাণ আছে। তবে আদালতে দাঁড়াবে কিনা বলতে পারি না। এবার আমরা বাড়ি ফিরব, বেলা দেড়টা বেজে গেছে।’

‘চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।’

পুলিস-কারে যাইতে যাইতে বেশি কথা হইল না। একবার বিরাট বলিলেন, ‘ভুবনকে অ্যারেস্ট করি তাহলে?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘করুন। সে যদি স্বীকার করে তাহলে সব ন্যাটা চুকে যাবে।’

বাড়ির ফটকের সামনে আমাদের নামাইয়া দিয়া গাড়ি চলিয়া গেল, বরাট বলিয়া গেলেন, ‘বিকেলবেলা আসব।’

অপরাহ্নে আন্দাজ পাঁচটার সময় আমরা ক্ষীরের মালপোয়া লইয়া বসিয়াছি এমন সময় প্রমোদ বরাট আসিলেন।

মণীশবাবু কয়লাখনিতে গিয়াছেন, ফণীশ বাড়িতে আছে। ইন্দিরা এতক্ষণ আমাদের কাছেই ছিল, এখন বিরাটকে দেখিয়া ভিতরে গিয়াছে। আসামী কে তাহা শুনিবার পর আমার মাথাটা হিজিবিজি হইয়া গিয়াছিল, এখন কতকটা ধাতে আসিয়াছে।

ইন্সপেক্টর বরাটের মুখখানা শুষ্ক, মন বিক্ষিপ্ত; সকালবেলা যে ইউনিফর্ম পরিয়া ছিলেন, এখনও তাঁহাই পরিয়া আছেন মনে হয়। তিনি আসিয়া হাস্যহীন মুখে পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিলেন; বলিলেন, 'এই নিন। আঙুলের ছাপের ফটো আর রিপোর্ট। তিনজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ খামটি না খুলিয়াই পকেটে রাখিল, বরাটের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, 'আজ দুপুরে আপনার খাওয়া হয়নি দেখছি।'

বরাট মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'খাওয়া হবে কেথেকে। আপনার আসামী পালিয়েছে।' ব্যোমকেশ এমনভাবে ঘাড় নাড়িল যেন ইহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল। তারপর বিরাটকে বসিতে বলিয়া সে ফণীশের পানে চাহিল। ফণীশ দ্রুত অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। বিরাট হেলান দিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিলেন, 'শুধু আসামী নয়, মোহিনীও পালিয়েছে। দু'জনে ট্যাক্সিতে চড়ে হাওয়া হয়েছে। কনস্টেবলটা প্রাণহারির বাড়িতে পাহারায় ছিল, কিন্তু

মোহিনীকে আটক করবার হুকুম তার ছিল না। ভুবন দাস ট্যাক্সিতে এসে রাস্তা থেকে হর্ন বাজালো, মোহিনী বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে চড়ে বসল। দু'জনে চলে গেল।'

ফণীশ এক থালা খাবার আনিয়া বরাটের সম্মুখে রাখিল, বরাট বিমর্ষভাবে আহার করিতে লাগিলেন। আমরাও মালপোয়াতে মন দিলাম। নীরবে আহার চলিতে লাগিল।

বৈষ্ণবীয় জলযোগ সমাধা করিয়া সিগারেট ধরাইবার উপক্রম করিতেছি, বাহিরের দিক হইতে আদলি জাতীয় একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথায় গান্ধী-টুপি, পরিধানে খদ্দরের চাপকন ও পায়জামা; তাই হঠাৎ তাহাকে চিনিতে পারি নাই। সে মাথার টুপি খুলিয়া মেঝোয় আছাড় মারিল। তারপর বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলিল, 'শালাদের ধরেছি স্যার।'

বিকাশ দত্ত। টুপি খুলিতেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে। ব্যোমকেশ সমাদর করিয়া বলিল, 'এস এস বিকাশ। কাজ সেরে ফেলেছি তাহলে?'

'সেরেছি স্যার। আমার মাথা ফাটাবার তালে ছিল, তাতেই ধরা পড়ে গেল।' বিকাশ হাত-পা ছড়াইয়া একটা সোফায় বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, 'দু'জনেই শালা।'

'দু'জনেই শালা-কাদের কথা বলছ?'

বিকাশ উত্তর দিবার পূর্বেই সুরপতি ঘটক প্রবেশ করিলেন। শৌখিন বেশবাস সত্ত্বেও একটু ভিজাবিড়াল ভাব, চোখে সতর্ক বিড়ালদৃষ্টি। তিনি ঘরের পরিস্থিতি ক্ষিপ্র-মসৃণ চক্ষে দেখিয়া লইয়া বিনীত স্বরে বলিলেন, 'কর্তা আছেন কি? তাঁর সঙ্গে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন সুরপতিবাবু।'

বিকাশ সহসা খাড়া হইয়া বসিল, একাগ্র চক্ষে সুরপতিবাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'এঁর নাম সুরপতি ঘটক? বড় অফিসের বড়বাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। কেন বল দেখি?'

বিকাশ সুরপতিবাবুর দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এঁর দুই শালার কথা বলছিলাম স্যার। বিশ্বনাথ আর জগন্নাথ রায়। তারাই কয়লাখনিতে বজ্জাতি করছে।'

সুরপতির চোখে ভয় উছলিয়া উঠিল, তিনি শীর্ণকণ্ঠে বলিলেন, 'কী? কী? আমি তো কিছু—'

বরাট তাঁহার দিকে ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'সুরপতিবাবু, যে দু'টি ছোকরাকে আপনি আমাদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টায় ছিলেন, তারা আপনার শালা?'

সুরপতিবাবু বলিলেন, 'মানে—তাতে কি হয়েছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়নি কিছু। কাল রাত্রে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে তিনজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আমরা মিলিয়ে দেখতে চাই, তিনজনের মধ্যে আপনি আছেন। কিনা—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি সুরপতিবাবুর আঙুলের ছাপ নিন। মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে উনি এই ষড়যন্ত্রে কতদূর আছেন। ফণীশ, বাড়িতে রবারস্ট্যাম্প-কালির প্যাড আছে?'

সুরপতিবাবু এক-পা এক-পা করিয়া পিছু হটতেছিলেন, দ্বারের কাছাকাছি গিয়া তিনি পাক খাইয়া পালাইবার চেষ্টা করিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় মণীশবাবু ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন, দুজনেই পড়িতে পড়িতে তাল সামলাইয়া লইলেন, তারপর সুরপতি ঘটক তুরঙ্গ গতিতে পলায়ণ করিলেন।

মনীশবাবু এইমাত্র কয়লাখনি হইতে ফিরিয়াছেন, ঘরে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিলেন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, কী হচ্ছে এখানে?–ইন্সপেক্টর বরাট–সুরপতি আমন লাফ মেরে পালালো কেন?'

বরাট বলিলেন, 'আপনি বসুন। আপনার খনিতে যারা অনিষ্ট করছিল তারা ধরা পড়েছে।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'ধরা পড়েছে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ছেলেটির নাম বিকাশ দত্ত, ও আমার সহকারী। ইন্সপেক্টির বরাটের সঙ্গে পরামর্শ করে বিকাশকে হাসপাতালের আর্দালি সাজিয়ে খনিতে পাঠিয়েছিলাম। ও ধরেছে।'

মণীশবাবু বলিলেন, 'কে-কারা-?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সুরপতি ঘটক ও তার দুই শালা।'

'অ্যাঁ! সুরপতি!' মণীশবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, 'কিন্তু–সুরপতি! সে যে আমার অফিসে বিশ বছর কাজ করছে। তার এই কাজ।'

আমরা আবার উপবেশন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'মণীশবাবু, দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করলে মানুষ স্ত্রীর বশীভূত হয়, সুরপতিবাবু শালাদের বশীভুত হয়েছেন। খুব বেশি তফাৎ নেই।'

মনীশবাবু বলিলেন, 'কিন্তু কেন? ওরা আমার অনিষ্ট করতে চায় কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সেটা এখনো আবিষ্কার করা যায়নি। তবে আবিষ্কার করা শক্ত হবে না। আমার মনে হয়, যে মাড়োয়ারি আপনার খনি কিনতে চেয়েছিল। সেই আড়ালে

থেকে কলকাঠি নাড়ছে। কিংবা অন্য কেউ হতে পারে। সুরপতিবাবুকে চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়বে।'

'কিন্তু–সুরপতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু পেয়েছেন?'

'এখনো পাইনি। কিন্তু আঙুলের ছাপ নেবার নামে উনি যেরকম লাফ মেরে পালালেন, ওঁর মনে পাপ আছে।'

মণীশবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, তিনি যত না বিস্মিত হইয়াছেন , ততোধিক দুঃখ পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'আপনারা বসুন। ফণী, তুমি আমার সঙ্গে এস। অফিসের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আর সুরপতির–তিনি সপ্রশ্ন নোত্রে বরাটের পানে চাহিলেন।

বরাট বলিলেন, 'সুরপতির ব্যবস্থা আমি করব।'

মণীশবাবু পুত্রকে লইয়া অফিসের দিকে চলিয়া গেলেন।

আমরা চারজন কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ অলসকণ্ঠে বলিল, 'ভুবনের নামে হুলিয়া জারি করেছেন নিশ্চয়?'

বরাট বলিলেন, 'সারাদিন তাতেই কেটেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আশাপ্রদ কোনো খবর নেই?'

বরাট বলিলেন, 'চল্লিশ মাইল দূরে একটা রেলওয়ে স্টেশন থেকে খবর পেয়েছি, একটা চালকহীন নম্বরহীন ট্যাক্সি সেখানে পড়ে আছে। লোক পাঠিয়েছি। হয়তো ভুবনের ট্যাক্সি্ ্, সে ওখানে ট্যাক্সি ছেড়ে ট্রেন ধরেছে।'

'বোম্বাই গেছে কি মাদ্রাজ গেছে কে জানে।'

'হুঁ। আজ উঠি।'

'আচ্ছা, আসুন। আসামীকে ধরা আপনার কর্তব্য, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন জানি। তবু, যদি ওদের ধরতে না পারেন। আমি খুশি হব।'

ইন্সপেক্টর বিরাট একটু হাসিলেন।

০৫. ব্যোমকেশ গল্প আরম্ভ করিল

নৈশ আহারের পর মণীশবাবু শয়ন করিতে গিয়াছিলেন; ফণীশ চুপি চুপি আসিয়া আমাদের ঘরে ঢুকিল। আজ আমাদের ঘরে তিনজনের শয়নের ব্যবস্থা, বিকাশের জন্য একটি ক্যাম্প খাট পাতা হইয়াছে।

ঘরে তিনজনেই উপস্থিত ছিলাম, বিছানায় শুইয়া সিগারেট টানিতেছিলাম; বিকাশ কি করিয়া শালদের ধরিল তাঁহারই গল্প বলিতেছিল। ফণীশকে দেখিয়া ব্যোমকেশ বালিশে কনুই দিয়া উঁচু হইয়া বসিল।

'এস ফণীশ।'

ফণীশ ব্যোমকেশের খাটের পাশে চেয়ার টানিয়া বসিল, অনুযোগের সুরে বলিল, 'কালই চলে যাবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, শালাবাবুরা যে রকম শাসিয়েছে তাড়াতাড়ি কেটে পড়াই ভাল। তুমি যদি বৌমাকে নিয়ে কলকাতায় আসো নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। বৌমাকে সত্যবতীর খুব পছন্দ হবে।' বলিয়া যেন পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া একটু হাসিল।

ফণীশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'গল্পটা শুনব।'

ব্যোমকেশ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, মাথার বালিশটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, 'গল্প শুনবে-প্রাণহারির গল্প? বেশ, বলছি; কিন্তু গল্পটা গল্পই হবে, আগাগোড়া সত্য ঘটনা হবে। না। অনেকটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত।'

ফণীশ ভ্রূ তুলিয়া প্রশ্ন করিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝলে না? যাঁরা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন তাঁরা সরাসরি ইতিহাস লেখেন না, ইতিহাস থেকে গোটা-কয়েক চরিত্র এবং ঘটনা তুলে নিয়ে সেই কাঠামোর ওপর নিজের গল্প গড়ে তোলেন। আমি তোমাকে যে গল্প বলব সেটাও অনেকটা সেই ধরনের হবে। সব ঘটনা জানি না, যেটুকু জানি তা থেকে পুরো গল্পটা গড়ে তুলেছি; কল্পনা আর সত্য এ গল্পে সমান অংশীদার।–শুনতে চাও?'

ফণীশ বলিল, 'বলুন।'

ব্যোমকেশ নূতন সিগারেট ধরাইয়া গল্প আরম্ভ করিল—

ভুবনেশ্বর দাসকে দিয়েই গল্প আরম্ভ করি। তার নাম শূনেও আমার সন্দেহ হয়নি যে সে বাঙালী নয়, ওড়িয়া। বাংলাদেশ আর উড়িষ্যার সঙ্গমস্থলে যারা থাকে তারা দুটো ভাষাই পরিষ্কার বলতে পারে, বোঝবার উপায় নেই বাঙালী কি ওড়িয়া। যদি বুঝতে পারতাম, সমস্যাটা অনেক আগেই সমাধান হয়ে যেত। কারণ মোহিনী উড়িষ্যার মেয়ে। দুই আর দুয়ে চার।

মোহিনী ভুবনেশ্বরের বৌ। যারা মেয়ে-মরদে গতর খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করে ওরা সেই শ্রেণীর লোক। ভুবন কাজ করত কটকের একটা মোটর মেরামতির কারখানায়। মোহিনী বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করত। আর দু'জনে দু'জনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। এই ভালবাসাই হচ্ছে। এ গল্পের মূল সূত্র।

ভুবনের মনে উচ্চাশা ছিল, মোহিনীর দাসীবৃত্তি তার পছন্দ ছিল না। মোটর কারখানায় কাজ করতে করতে মিলিটারিতে ট্রাক-ড্রাইভারের চাকরি যোগাড় করে সে চলে গেল; মোহিনীকে বলে গেল-টাকা রোজগার করে ট্যাক্সি কিনব, তোকে আর চাকরি করতে হবে না।

বছর দুই ভুবনের আর দেখা নেই। ইতিমধ্যে মোহিনী কটকে প্রাণহরি পোদ্দারের বাড়িতে চাকরি করছে; দিনের বেলা কাজকর্ম করে, রাত্তিরে বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যায়।

প্রাণহরি লোকটা অতিবড় অর্থপিশাচ। যেমন কৃপণ তেমনি লোভী। সারা জীবন টাকাটাকা করে বুড়ো হয়ে গেছে, জুছুরি দাগাবাজি ব্ল্যাকমেল করে অনেক টাকা জমা করেছে, তবু তার টাকার ক্ষিদে মেটেনি। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তার মনে লোভ নেই, কিংবা বুড়ো বয়সে সে লোভ কেটে গিয়েছিল। কিন্তু মোহিনী যখন তার বাড়িতে চাকরি করতে এল তখন তাকে দেখে প্রাণহারির মাথায় এক কুবুদ্ধি গজালো, সে টাকা রোজগারের

নতুন একটা রাস্তা দেখতে পেল। বড় মানুষের উদ্ধৃঙ্খল ছেলেরা তার বাড়িতে জুয়া খেলতে আসে, তাদের চোখের সামনে মোহিনীর মত মেয়েকে যদি ধরা যায়–

মোহিনীর দেহে যে প্রচণ্ড যৌন আকর্ষণ আছে তাই দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে প্রাণহারির মনে ভুল ধারণা জন্মেছিল। সে বড়মানুষের ছেলেদের ধাপ্পা দিয়ে মোহিনীর নাম করে টাকা নিত। কিন্তু মোহিনী ধরা-ছোঁয়া দিত না। কিছুদিন এইভাবে চলাবার পর বড়মানুষের ছেলেরা বিগড়ে গেল, তারা টাকা ঢেলেছে, ছাড়বে কেন? তারা প্রাণহারিকে প্রহার দেবার মতলব করল।

প্রাণহরি দেখল কটক থেকে কেটে না পড়লে মার খেতে হবে। কিন্তু মোহিনীকেও তার দরকার, এমন মুখরোচক টোপ সে আর কোথায় পাবে? সে মোহিনীর কাছে প্রস্তাব করল তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। মোহিনীর আপত্তি নেই; তার স্বামী বিদেশে, তাকে দাসীবৃত্তি করে খেতে মুকুতার কাছে কষ্টকও যা অন্য জায়গাও তাই। সে দেড়া মাইনেতে প্রাণহারির সঙ্গে যেতে রাজী হল।

কিন্তু তারা কটক ছাড়বার আগেই ভুবন ফিরে এল। ভুবন চাকরি করে কিছু টাকা সঞ্চয় করেছে, কিন্তু ট্যাক্সি কেনার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। স্বামী-স্ত্রী মিলে পরামর্শ করল, তারপর ভুবন প্রাণহারির কাছে গেল।

ভুবন প্রাণহারিকে টাকার কথা বলল; তার কিছু টাকা আছে, আরও আড়াই হাজার টাকা পেলেই সে নিজের ট্যাক্সি কিনতে পারবে। প্রাণহরি ভেবে দেখল, টাকা ধার দিলে ভুবন

আর মোহিনী দু'জনেই তার মুঠোর মধ্যে থাকবে; মোহিনীকে তখন হুকুম মেনে চলবে হবে। সে রাজী হল। রেজিস্ট্রি দলিল তৈরি হল, তাতে ধার-শোধের শর্ত রইল-মোহিনীর মাইনের পনরো টাকা কাটা যাবে, ভুবন তার ট্যাক্সির রোজগার থেকে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা দেবে, আর প্রাণহারি নিজের দরকারে ট্যাক্সি ব্যবহার করবে তার জন্য পঁচিশ টাকা দেবে।; এইভাবে প্রতিমাসে পচাত্তর টাকা শোধ হবে।

সকলেই খুশি। ভুবন ট্যাক্সি কিনল। তিনজনে কয়লা শহরে এল। তারপর প্রাণহরি শহরের হালচাল বুঝে নিয়ে তার অভ্যস্ত লীলাখেলা আরম্ভ করল।

কয়লা ক্লাব হচ্ছে বড়লোকের আস্তানা, প্রাণহরি সেখানে গিয়ে ছিপ ফেলল। চারটি বড় বড় রুই-কাৎলা তার ছিপে উঠল। সে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল।

জুয়া খেলার সময় মোহিনীকেও সকলে দেখল। বিশেষভাবে একজনের নজর পড়ল তার ওপর; অরবিন্দ হালদার চরিত্রহীন লম্পট, সে লোভে উন্মত্ত হয়ে উঠল। প্রাণহারি জুয়ায় চারজনকেই শোষণ করছিল, অরবিন্দ হালদারকে বেশি করে শোষণ করতে লাগিল। অরবিন্দকে সে জানিয়ে দিয়েছিল যে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া যায় না।

প্রাণহারির কাছে ছাড়পত্র পেয়ে অরবিন্দ হালদার সময়ে অসময়ে মোহিনীর কাছে আসতে লাগল। কিন্তু মোহিনী শক্ত মেয়ে, তাকে চোখে দেখে যা মনে হয় সে তা নয়। অরবিন্দের মতলব সে বুঝেছে, কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে তাকে তাড়িয়ে দেয় না। সে তার সঙ্গে খাতির করে কথা বলে, হয়তো হাসি-মস্করাতেও যোগ দেয়, কিন্তু তার দেওয়া

উপহার নেয় না। প্রাণহারি মোহিনীকে বোধ হয় ইশারা দিয়েছিল; ইশারায় যতখানি স্বীকার করা সম্ভব মোহিনী ততখানি স্বীকার করে চলত। প্রাণহোর ঘুঘু লোক, স্পষ্টভাবে মোহিনীকে কিছু বলেনি; ভেবেছিল ইশারাতেই কাজ হবে। হাজার হোক, মোহিনী নিম্নশ্রেণীর মেয়ে।

কিছুদিন চেষ্টা-চরিত্র করে অরবিন্দ বুঝল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। ওদিকে জুয়াতেও তারা অনেক টাকা হেরেছে। তারপর একদিন প্রাণহোরর বেইমানি ধরা পড়ে গেল। জুয়া খেলা বন্ধ হল।

জুয়াতে যারা হেরেছিল তাদের সকলেরই রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অরবিন্দের রাগ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ সে জুয়াতেই ঠকেনি, অন্য বিষয়েও ঠকেছিল। ঠকেছিল এবং অপমানিত হয়েছিল। তাই সে একদিন তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে প্রাণহারিকে ঠেঙাতে গেল।

দৈবক্রমে যে ট্যাক্সিতে চড়ে তারা প্রাণহারিকে ঠেঙাতে গেল সে ট্যাক্সিটা ভুবন দাসের। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে অরবিন্দ বোধ হয় মোহিনীর সম্বন্ধে তার মনের আফসানি প্রকাশ করেছিল, ভুবন তার কথা শুনে বুঝল, প্রাণহরি দু'হাজার টাকা নিয়ে তার বৌকে বিক্রি করেছে।

কয়লা শহরে ভুবনের বাসা ছিল না; প্রাণহরিও তার বাড়িতে ভুবনকে থাকতে দেয়নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ভুবন ফুরসৎ পেলেই চুপিচুপি এসে মোহিনীর কাছে রাত কাটিয়ে

যেত। স্বামী-স্ত্রীতে কথা হত; হয়তো মোহিনী স্বামীকে ইশারা দিয়েছিল-বুড়োটা লোক ভাল নয়। ভুবন মনে মনে প্রাণহারিকে ঘৃণা করত। খাতকের সঙ্গে মহাজনের ভালবাসা বড়ই বিরল। কিন্তু ভুবন সাবধানী লোক, সে বলত-ধারটা শোধ হলে ট্যাক্সি পুরোপুরি তার নিজের হয়ে যাবে, তখন তারা গাড়ি নিয়ে চলে যাবে, বুড়োর সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

প্রাণহরি যে এতবড় শয়তান তা ভুবন কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু যখন সে শুনল যে প্রাণহরি দু'হাজার টাকা নিয়ে তার বৌকে বিক্রি করেছে তখন তার মাথায় খুন চেপে গেল। দুনিয়ায় পয়সাওয়ালা লম্পট অনেক আছে পরাস্ত্রীর ওপর তারা নজর দেয়; তাদের ওপর ভুবনের রাগ নেই। কিন্তু ওই বুড়ো শয়তানটাকে সে খুন করবে।

খুন করবার সুযোগও হাতে হাতে এসে গেল। প্রাণহারির বাড়ির কাছাকাছি এসে চারজন আরোহী নেমে গেল। ভুবন ট্যাক্সির মুখ ঘুরিয়ে রাখল; তারপর সেও বেরুলো। তার হাতে মোটরের স্প্যানার।

ভুবন প্রাণহারির বাড়িতে প্রত্যহ দিনে রাত্রে দু'বার তিনবার এসেছে, সে জানতো বাড়ির পিছন দিকে ওপরে ওঠবার মেথরখাটা সিঁড়ি আছে। সে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে গেল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দোরে টোকা মারল।

দু'দিকের দোর বন্ধ করে প্রাণহরি নিজের ঘরে ছিল; সে বোধহয় জানতে পারেনি যে, তাকে চারজনে ঠেঙাতে এসেছে। কিন্তু সে হুঁশিয়ার লোক; টোকা শুনে স্নানের ঘরে

গেল। তারপর যখন জানতে পারল যে ভুবন এসেছে তখন সে দোর খুলে দিল। কারণ ভুবনের ওপর তার কোনো সন্দেহ নেই।

দু'জনে শোবার ঘরে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল।

তাদের মধ্যে কোনো কথা হয়েছিল। কিনা জানি না। ভুবনের বাঁ হাতে ছিল স্প্যানার, সে আচমকা স্প্যানার তুলে মারলো প্রাণহারির মাথায় এক কোপ। প্রাণহরি মুখ খোলবার সময় পেল না; তৎক্ষণাৎ পতন ও মৃত্যু।

ভুবন তখন সাবধানে সামনের দরজা খুলল। তার বোধ হয় মতলব ছিল সামনের দিকে সাড়াশব্দ না পেলে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে, পিছনের দরজা বন্ধ থাকবে। কিন্তু সামনে বোধহয় তখন এরা চারজন সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছিল। তাই ভুবন সামনের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যো-পথে এসেছিল। সেই পথে ফিরে গেল। স্প্যানারটা সঙ্গে নিয়ে গেল। এখন পরিস্থিতি দাঁড়াল, সামনের দরজাও খোলা, পিছনের দরজাও খোলা। প্রাণহোরর আততায়ী কোন দিক দিয়ে ঢুকেছে অনুমান করা শক্ত।

অরবিন্দ প্রথম বার প্রাণহোরর দরজা বন্ধ পেয়েছিল; দ্বিতীয় বার চারজনে উঠে দেখল। দরজা খোলা এবং প্রাণহরি পোদ্দার ইহলীলা সম্বরণ করেছে। তারা দুদ্দাড় শব্দে পালালো। ট্যাক্সির কাছে ফিরে গিয়ে দেখল ট্যাক্সি-ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। তারা ড্রাইভারকে জাগিয়ে শহরে ফিরে গেল।

ওদিকে মোহিনী রান্না করছিল, সে কিছুই জানতে পারেনি। রান্নার ছাকৈছোঁক শব্দে দুরের শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল। রান্না শেষ হবার পর সে যখন দেখল। বুড়ো খেতে নামছে না, তখন সে ওপরে গেল। সে দেখল প্রাণহরি মারে পড়ে আছে, সামনের এবং পিছনের দরজা খোলা। অরবিন্দের কথা তার মনে এল না। তার মনে এল ভুবনের কথা। যেখানে ভালোবাসা সেখানেই শঙ্কা। ভুবনকে সে ইশারা দিয়েছিল, বুড়ো লোক ভাল নয়। ভুবন বাইরে বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু তার ভিতরে আছে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের উগ্রতা। স্ত্রীর অমযদি সে সহ্য করবে না।

মোহিনী মেয়েটা ভারি বুদ্ধিমতী। মড়া দেখেও তার মাথা খারাপ হল না, সে চট্ট করে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। খুন যেই করুক, তাকে যেন পুলিস ধরতে না পারে। হত্যাকারী স্নানঘরের দোর দিয়ে ঢুকেছে এবং সেই দিক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছে, মোহিনীর তাতে সন্দেহ নেই। সে পিছন দিকের দরজা দুটো ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল , তারপর ট্রাক-ড্রাইভার মারফত পুলিসে খবর পাঠালো। কী সাংঘাতিক মেয়ে দ্যাখো, একটুকু বাড়াবাড়ি করেনি। পুলিসকে ভুল রাস্তায় চালাবার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু করেছে।

মোহিনী আমাদের আছে অনেক মিথ্যে কথা বলেছে, কিন্তু কখনো অনাবশ্যক। মিথ্যে কথা বলেনি। ভুবনও তাই। আমার বিশ্বাস যে-রাত্রে খুন হয় সেই রাত্রেই কোনো সময় ভুবন ফিয়ে গিয়ে মোহিনীকে সব কথা বলেছিল এবং তারপর থেকে প্রায়ই গিয়ে দেখা করত। এই জন্যেই মোহিনী খুনের পর বাড়ি ছেড়ে যেতে চায়নি। ভুবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখা নিতান্ত দরকার।

যাহোক, আমি যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলাম তখন পুলিসের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়েছে চারজন আসামীর ওপর। মোটিভ এবং সুযোগ এদের পুরোদস্তুর বিদ্যমান। হয় এরা চারজনে একজোট হয়ে খুন করেছে, নয়তো ওদের মধ্যে একজন খুন করেছে। অন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে।

পুলিসের সঙ্গে আমার মতভেদের কোনো কারণ ছিল না; তবু একজোট হয়ে খুন করার প্রস্তাবটা হজম করা শক্ত। সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা মধ্যভারতের ডাকাত নয়, তারা সমাজবাসী তথাকথিত সভ্য মানুষ। তারা দল বেঁধে খুন করবে না।

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন অন্য তিনজনের চোখে ধুলো দিয়ে খুন করে থাকতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে? সবচেয়ে বেশি সন্দেহ অরবিন্দ হালদারের ওপর। সে শুধু জুয়াতেই ঠিকেনি, আর এক বিষয়ে ঠিকেছে; যার জন্যে তার লজার অবধি নেই; যে কথা সে কারুর কাছে স্বীকার করতে পারে না। লম্পটের লজ্জা এক বিচিত্র বস্তু; সে কেবল তখনি লজ্জা পায় যখন দুহাজার টাকা খরচ করেও সে তার নির্লজ্জ কামনার বস্তু পায় না।

অনুসন্ধান আরম্ভ করে আমার খটকা লাগল। প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমার মনে মাথা তুলল। সেটি হচ্ছে-মারণাস্ত্রটা গেল কোথায়? ডাক্তার ঘোষাল যে ধরনের বর্ণনা দিলেন সে রকম কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি; অরবিন্দের দলের কেউ যদি অস্ত্র আনতো তাহলে

ফণীশ আর ভুবনের চোখ এড়াতে পারতো না। সুতরাং ওরা অস্ত্রটা আনেনি, নিয়েও যায়নি। তবে সেটা এল কোথেকে এবং গেল কোথায়?

দ্বিতীয় কথা, ডাক্তার ঘোষালের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, হত্যাকারী লোকটা ন্যাটা। ভেবে দ্যাখো, প্রাণহারির শোবার ঘরে একটা চেয়ার পর্যন্ত নেই; সে আততায়ীর দিকে পিছন ফিরে তক্তপোশের কিনারায় বসেছিল একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আততায়ী তাকে মেরেছে, আঘাত লেগেছে মাথার ডানদিকে সিঁথির মত। সুতরাং আততায়ী ন্যাটা, তার বাঁ হাত বেশি চলে।

চারজন আসামীয় মধ্যে কে ন্যাটা খোঁজ করলাম। কয়লা ক্লাবে গিয়ে দেখলাম, মৃগেন মৌলিক ডান হাতে টেনিস খেলছে, মধুময় সুর আর অরবিন্দ হালদার ডান হাতে তাস ভেঁজে তাস বাঁটছে এবং খেলছে। তখন ফণীশের দিকে কাচের কাগজ চাপা গোলা ফেলে দেখলাম। সেও ডান হাতে গোলা ধরল। ওরা কেউ ন্যাটা নয়।

কিন্তু ন্যাটা না হোক, ওদের মধ্যে কেউ সব্যসাচী হতে পারে। কাজেই ওদের একেবারে ত্যাগ করতে পারলাম না। ওরা ছাড়া সন্দেহভাজন আর কেউ নেই। মোহিনী খুন করেনি, তার খুন করবার ইচ্ছে থাকলে সে প্রাণহারিকে বিষ খাওয়াতো; তার মোটিভও কিছু নেই।

আমি কোনো দিকে দিশা খুঁজে পাচ্ছি না, এমন সময় এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল; যেন মেঘে ঢাকা অন্ধকার রাত্রে বিদ্যুৎ চমকালো। দেখলাম ভুবন তার ট্যাক্সির চাকার তলায় জ্যাক বসিয়ে বাঁ হাতে ঘোরাচ্ছে!

খুনের রাত্রে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভুবনেশ্বর দাস যে অকুস্থলে উপস্থিত ছিল তা আমরা সকলেই জানতাম, অথচ তার কথা একবারও মনে আসেনি। একেই জি. কে. চেস্টারটন বলেছেন, অদৃশ্য মানুষ–Invisible Man.

অস্ত্রের সমস্যা এক মুহূর্তে সমাধান হয়ে গেল। স্প্যানার দিয়ে ভুবন প্রাণহারিকে মেরেছিল; ডাক্তার ঘোষাল মারণাস্ত্রের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে।

ভুবন বৌকে নিয়ে পালিয়েছে। ভারি বুদ্ধিমান লোক, আমি তাকে চিনেছি তা বুঝতে পেরেছিল। কোথায় গিয়ে তারা আস্তানা গাড়বে জানি না; মাদ্রাজ বোম্বাই কত জায়গা আছে। আশা করি প্রমোদবাবু ভুবনকে খুঁজে পাবেন না। কারণ, যদি খুঁজে পান নিশ্চয় তাকে সোনার মেডেল দেবেন না।

আর কিছু বলবার নেই। যদি কোনো কথা বাদ পড়ে থাকে তোমরা আন্দাজ করে নিতে পারবে। ভুবন আর মোহিনী চিরজীবন ফেরারী হয়ে থাকবে, যদি না ধরা পড়ে। প্রাণহারি পোদ্দারের নিষ্ঠুর লোভ দুটো মানুষের জীবন নষ্ট করে দিল, এ কাহিনীর মধ্যে এইটেই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।